কলাভূমি কলিঙ্গ

চিত্তরঞ্জন মাইতি

অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ :
জন্মাষ্টমী, ভাদ্র—১৩৬৫

প্রকাশক
অমরেন্দ্র দত্ত
অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

ব্লক ও মুদ্রণ
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

বেঁধেছেন
শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
বিভূতি সেনগুপ্ত

পূজ্যপাদ আচার্য

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শিল্পী	আলোকচিত্র
শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু	দেব দিবাকর
	রথচক্রের অর্ক
	লতাকাম
	মন্দির মুক্তেশ্বর
	ব্রহ্মেশ্বরের কারুকৃতি
	তপন ও তুরঙ্গ
শ্রীযুক্ত শিবতোষ মুখোপাধ্যায়	মন্দিরাবাদিনী
	গজেন্দ্র গমন
উড়িষ্যা সরকার ও ভারত সরকারের সৌজন্যে	'আনো মৃদঙ্গ…'
	পরম রমণীয়
	'অশোক তরু উঠত ফুটে'
	ক্লান্তি নিমগ্না
	সংহত শক্তির প্রতীক অশ্ব
	পত্রলেখা *

* ভুবনেশ্বরের এই বহু-খ্যাত মূর্তিটি মন্দির বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের মতে খাজুরাহো হইতে উড়িষ্যায় আনীত।

ক্লান্তি নিমগ্না
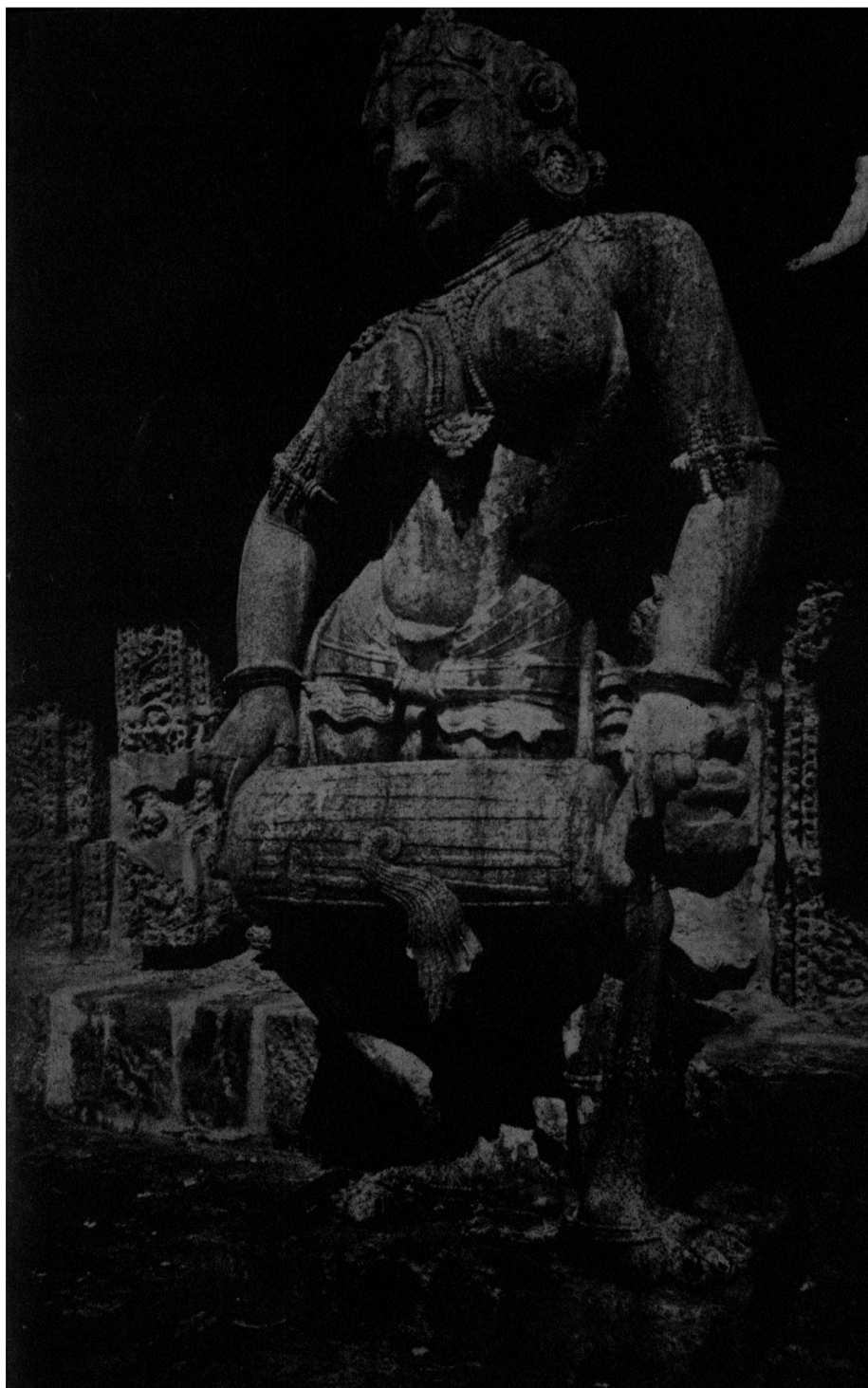
'প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্'

মন্দির — মুক্তেশ্বর
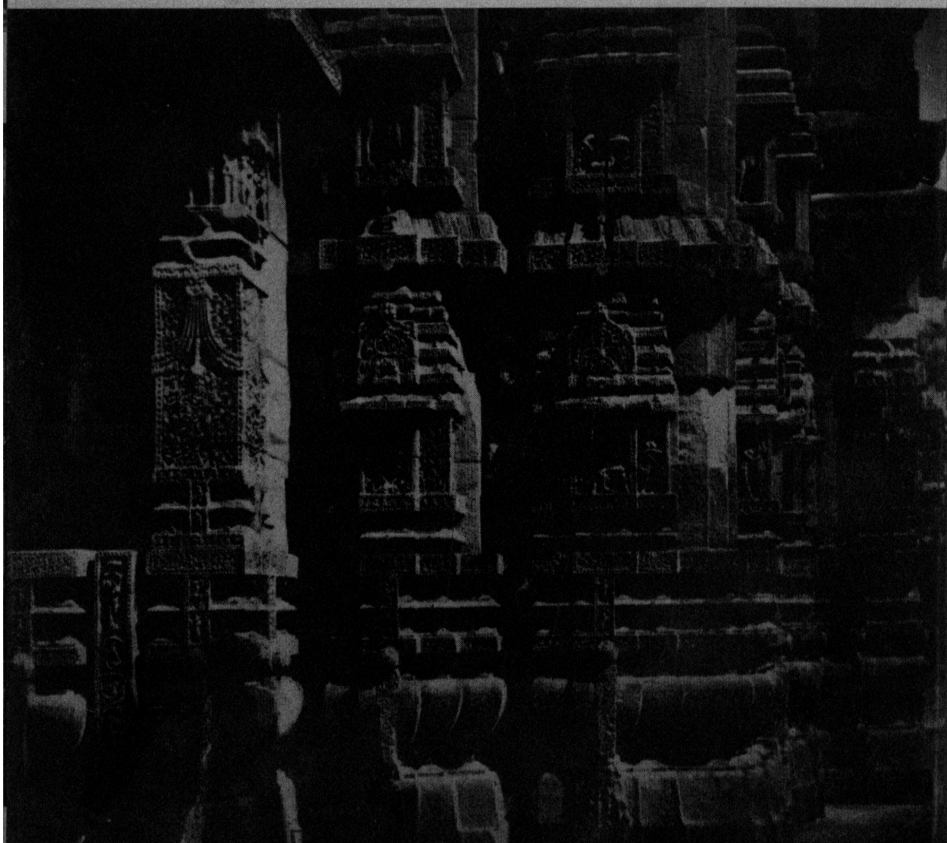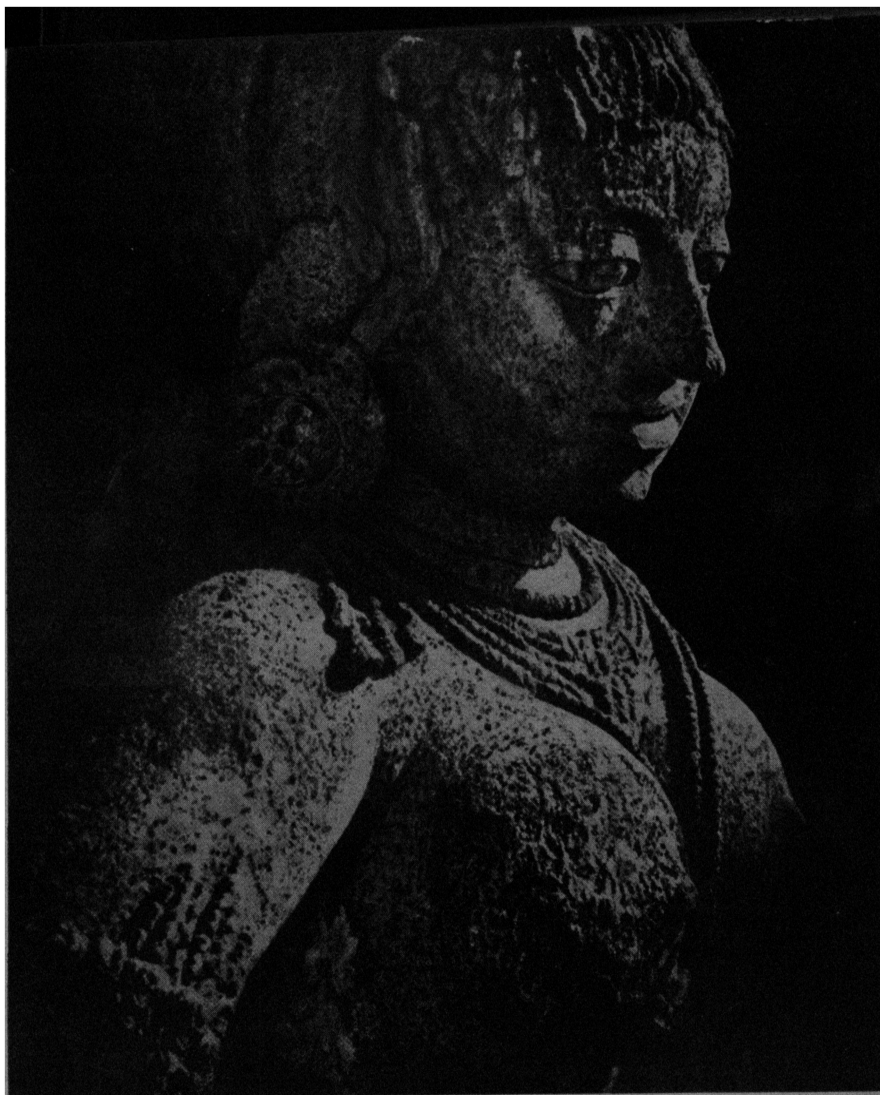
পরম রমণীয়

সংহত শক্তির প্রতীক অশ্ব

রথচক্রের অর্ক
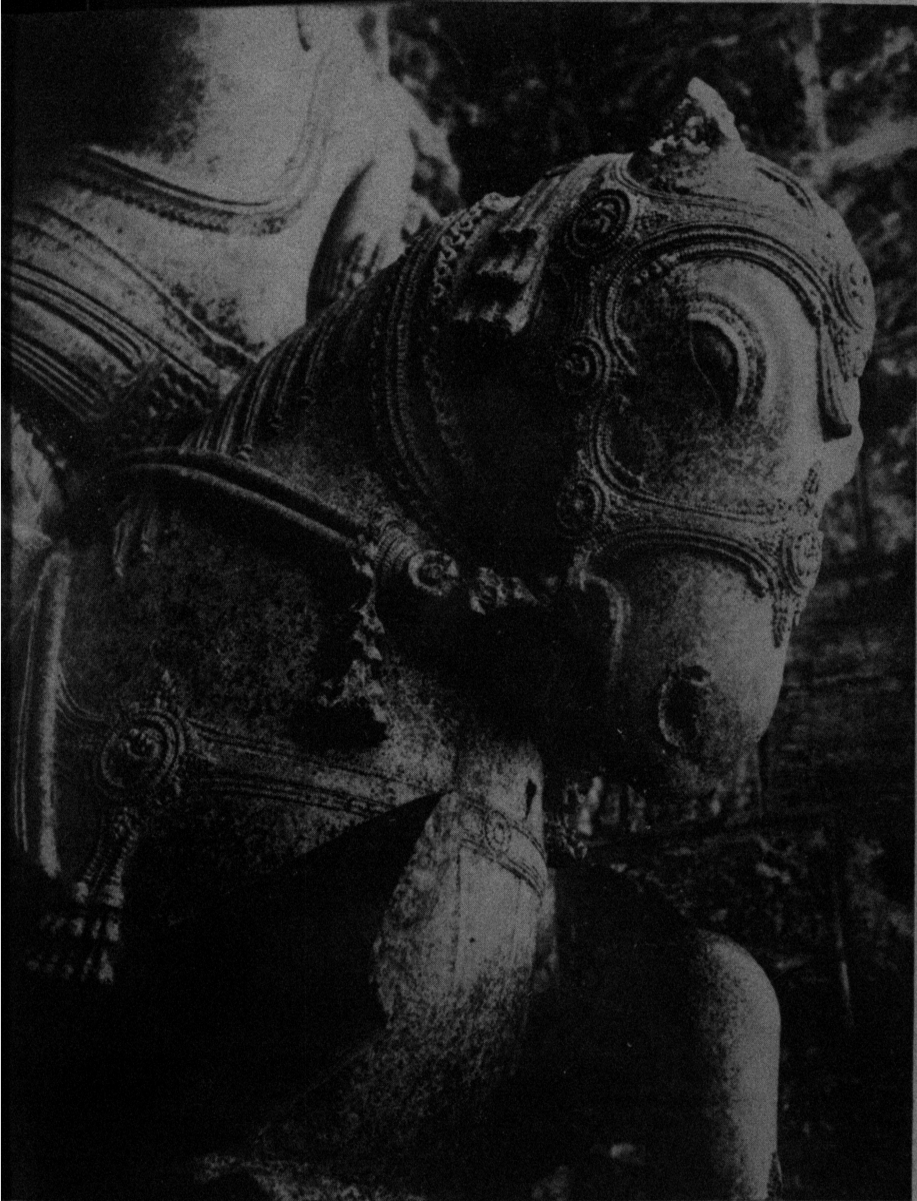
তপন ও তুরঙ্গ

মন্দিরে ফুললতা

মন্দিরাবাদিনী

পত্রলেখা

॥ কথারম্ভ ॥
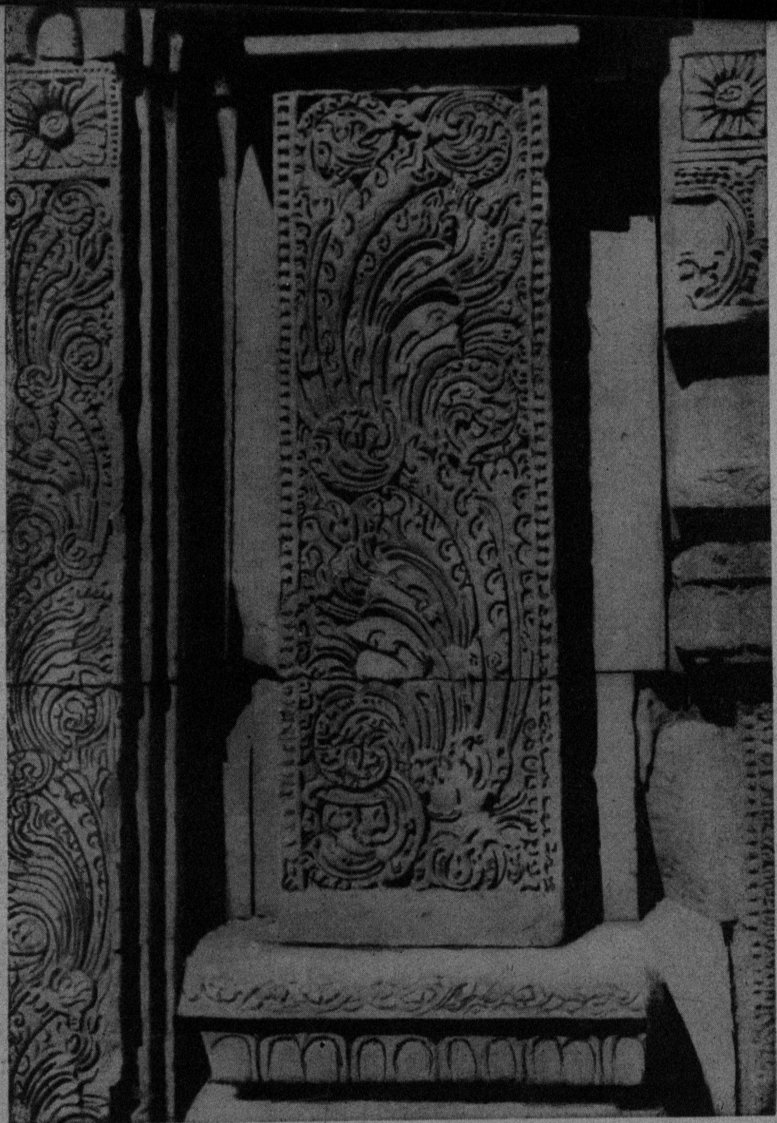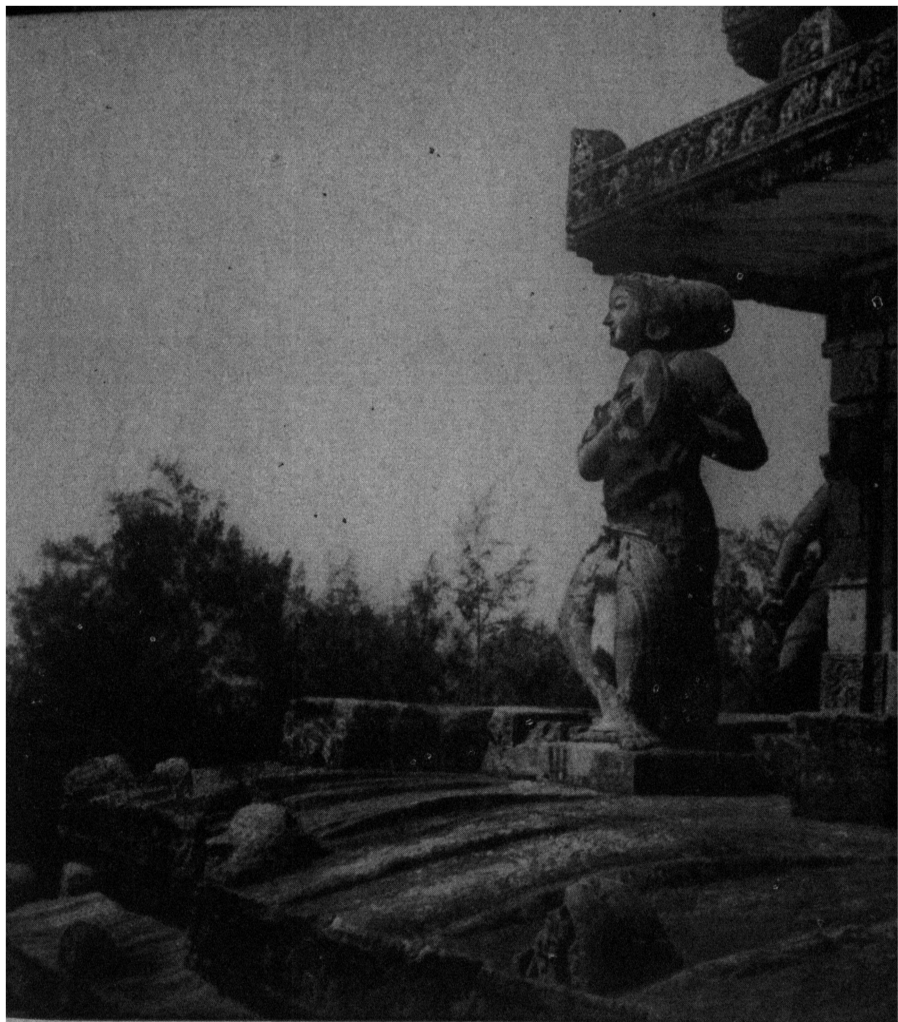
শিল্পী,

বারটি বসন্ত পার হয়ে গেল তুমি এলে না, তাই এ লিপি। মানুষের মুখে মুখে আজ তোমার নামগান শুনতে পাই। কলিঙ্গ জনপদের প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটীব --সর্বত্র তুমি বন্দিত। যে মন্দির তুমি রচনা করে চলেছ তদ্গত নিষ্ঠায়, তা যুগ যুগ ধরে মানুষের কাছে মহাবিস্ময় হয়ে রইবে, তার সঙ্গে তোমাকেও তারা স্মরণ করবে পরম শ্রদ্ধায়।

আমি সামান্যা কলিঙ্গকন্যা, আজ কি আমাকে তোমার মনে পড়বে শিল্পী? আমার পিতার তক্ষণশালায় বসে তুমি মূর্তি রচনায় মগ্ন হয়ে রইতে। আহার তৃষ্ণায় তুমি ছিলে সম্পূর্ণ উদাসীন। মনে পড়ে, একদিন তুমি আমার কাছে তৃষ্ণার বারি চেয়েছিলে। আমি ত্বরিতে শূন্য কুম্ভ পূর্ণ করে এনে দাঁড়িয়েছিলাম তোমার সামনে। তুমি বিস্মিত দুটি নয়নের দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। বুঝি ভুলে গিয়েছিলে পিপাসার কথা।

সে-কথা আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়েছিলাম, তুমি শুধু বলেছিলে, ঐ সামান্য ঘটের জলেই কি আমার তৃষ্ণা মিটবে কন্যা, আমার তৃষ্ণা যে অনন্ত!

কুণ্ঠায় বলেছিলাম, আমার যে আর কিছু সম্বল নেই কুমার।

তুমি হেসে বলেছিলে, তোমার হৃদয়ের ঘট পূর্ণ হয়ে আছে অনন্ত অমৃত রসে। সেই সুধা তুমি আমায় দান কর। আমি শিল্পী, অমরত্ব লাভ করি।

তারপর কত পাখি-ডাকা প্রভাত আর দীপ-জ্বালা সন্ধ্যা এসেছে। তোমার মুগ্ধ চোখে আমি অবগাহন করেছি। তুমি কখনো ডুব দিয়ে তোমার সাধনার গভীরে তুলে আনতে রূপমূর্তি, বলতে, এ তোমার দান কন্যা।

বলতাম, ও যে পাষাণী অহল্যা, তুমি তাতে প্রাণ দিয়েছ শিল্পী।

তারপর কত মুগ্ধক্ষণ চোখে চোখে চলত অমৃত সম্ভোগ।

একদিন তোমার ডাক এল রাজপ্রাসাদ থেকে। মহাকালের পাতায় রচনা করতে হবে একটি মনোরম কবিতা। যে রচনা হবে মানুষের শ্রেষ্ঠতম শিল্পকীর্তি। তুমি চললে তোমার এতদিনের সাধনার সিদ্ধিলাভের আশায়। আর সেদিন থেকে জ্বলল আমার পর্ণকুটীরে প্রতীক্ষার প্রদীপ। কত বর্ষা, কত বসন্ত, কত শীত আর কত শরৎ কেটেছে, শেফালির হাসি ঝরেছে, মাধবী বিদায় নিয়েছে। বর্ষার বেদনায় ভরা মেঘ শরতের সোনার আলোর আশ্বাসে শুভ্র সুন্দর হয়েছে—তবু আমার প্রতীক্ষার শেষ হল না—হতাশার হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠল আমার অন্তরের মণিদীপ। তাই আজ দীর্ঘ একযুগ পরে তোমায় পাঠালাম এ লিপি। দেশবন্দিত শিল্পীকে এই সামান্য হৃদয়ে বেঁধে রাখবার ধৃষ্টতা আমার আর নেই। একদিন তোমার পথ চেয়ে আমার জীবনের দীপ নিভে যাবে, তবু জেনো, আমার আকাঙ্খার দীপ অনির্বাণ হয়ে রইবে। সে দীপ তুমি একদিন জ্বালিয়ে গিয়েছ নিজ হাতে, তাই মৃত্যুর শীতলতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না কোনদিনও।… ..

মন্দির রচনায় তদ্গত শিল্পী পত্রবাহকের হাত থেকে প্রণয়িনীর লিপিখানি নিয়ে পাঠ করলেন। একবার তু-বার বার বার পাঠ করেও সম্পূর্ণ করতে পারলেন না সে লিপি লেখা। ভুলে-যাওয়া অতীত তার আনন্দ বেদনার ছায়া ফেলে গেল শিল্পীর

স্মৃতির পাতায়। একযুগ পূর্বের সেই শিশিরে ভেজা প্রভাতী পথে যেন প্রণয়িনীর পদধ্বনি শুনতে পেলেন শিল্পী। দেখতে পেলেন, সেই স্রোতস্বতীর পথে গাগরীভরণে চলেছে কলিঙ্গকন্যা।

তোমাকে আমি ভুলিনি কন্যা, আমার সৃষ্টির মাঝে তুমি রইবে চিরস্মরণীয়া হয়ে। যুগে যুগে তীর্থযাত্রীরা এসে দাঁড়াবে এই মন্দির অঙ্গনে। তারা দেখবে তোমায় এই মন্দির গাত্রে অনন্য ভঙ্গিমায়। তোমার মাঝে থেকে আমিও লাভ করব অমরত্ব। তোমাকে ছেড়ে আমার সাধনার সিদ্ধি সম্পূর্ণ হবে না কোনদিন।

মন্দিরদেহে নিপুণ কারিগর গড়ে তুলল এক প্রণয়িনী মূর্তি। অনন্য তার দেহ-ভঙ্গিমা—প্রেমপত্র-লিখনরতা। মহাকালের বুকে লেখা রইল কলিঙ্গকন্যার কামনা। তার সঙ্গে চিরঞ্জীবী হয়ে রইল প্রেমমুগ্ধ কলাকার।

আজও সুদূর কলিঙ্গের পথ-প্রান্তর নদীকান্তার পার হয়ে আসে এক আমন্ত্রণ-লিপি। সে আমন্ত্রণে লেখা থাকে এই কয়টি কথা—হে পথিক, তুমি এস এই কলাভূমি কলিঙ্গে, দেখে যাও এর মন্দিরে মন্দিরে মুগ্ধ শিল্পীর প্রেম লাভ করেছে অক্ষয় অমরত্বের অধিকার।

সে আহ্বানের আকর্ষণে ঘর ছেড়ে একদিন পথে বেরোলাম।

॥ পথযাত্রী ॥

এবারে যাত্রায় আমরা তিনজন। বন্ধুরা হাওড়া স্টেশনে বিদায় দিতে এসে বললেন, যাত্রায় কিন্তু ত্র্যহস্পর্শ দোষ ঘটেছে।

সুমতি হেসে জবাব দিলে, সমজাতীয় নয় তাই দোষস্খালন হয়ে যাবে।

সুমতি আর কুমতি দুটি বোন চলেছে আমার সঙ্গে। নাম দুটো ওদের আমারই দেওয়া। অবশ্য সেজন্য দায়ী কিন্তু নই আমি। ওদের আসল দুটো নাম এমনি অকারণ দীর্ঘ আর দুরুচ্চার্য যে যাত্রার পূর্বে নাম সংক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। দুটি কাগজে দুটি নাম লেখা হল। কিন্তু দুজনারই কুমতি নামের ওপর ঘোরতর বিকর্ষণ।

বললাম, এক নামের অধিকারিণী দুজনের সদা দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা, অতএব একজনকে কুমতি হতেই হবে। অবশ্য এ কথাও বোঝালাম, বহু পণ্ডিতের মতে নাম কোন প্রকার অর্থব্যঞ্জক নয়, সেদিক থেকে ভয়ের কোন সঙ্গত কারণই নেই।

কিন্তু কুমতির ওপর প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এমনি সব দোষারোপ করে বসে আছেন যে শত ব্যাখ্যাতেও তার দিকে কারু দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল না। অগত্যা সমাধানের জন্য দুজনকেই ভাগ্য পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। সুমতি কুমতি নাম লেখা দুটি কাগজকে ডেলা পাকিয়ে রাখা হল ওদের সামনে। এবার তুলে নাও যার যেটা খুশি। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রম্ ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।

বিধিলিপি খণ্ডায় কে। কুমতি গিয়ে পড়ল মাসতুতো বোনটির কপালে। পিসতুতো বোন ত আহ্লাদে আটখানা। ফোড়ন কাটলে, দেখলে ত দাদা যার যেমন মতি তার তেমনি নামের মাহাত্ম্য। ফোঁস করে উঠল কুমতি, আরে যা যা, ডাক্তারি স্বভাবের আর বড়াই করিসনে। গো-মড়কে মুচির পার্বণ, তোদের হল ঠিক তাই। মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লেই ত তোদের প্রাণের আশা পূর্ণ হয়।

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, জানো না দাদা সে-গল্প? এক ডাক্তার ভদ্রলোক তাঁর দূরদেশী প্রিয়তমাকে লিখলেন, কিছুকাল ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক, সামনেই বর্ষাকাল আসিতেছে। আমি মেঘের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি। এই মরসুমে ভগবানের দয়ায় কিছু লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় অবশ্যই পড়িবে। আর তখন অর্থ রোজগারের পথ সুগম হইবে। আশা করিতেছি পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপায় আশ্বিন মাসেই তোমাকে এখানে আনিবার মত অর্থ জোগাড় করিতে পারিব।—এই ত ওদের সুমতি দাদা, কপট হাসি এবার হানলেন উনি সুমতির দিকে।

চেঁচিয়ে উঠল দ্বিতীয়া, থামতে বলো দাদা ওল্ড ফসিলকে, ডাক্তারীর মাহাত্ম্য ও আবার বুঝবে কি।

প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন বলেই রাখি শ্রীমতী কুমতি এনসেণ্ট হিস্ট্রি এ্যাণ্ড কালচারের ছাত্রী, আর দ্বিতীয়াটি এখন মেডিক্যাল কলেজের শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছে।

কুমতিকে ওল্ড ফসিল বলার পেছনে সামান্য কারণ যে না ছিল এমন নয়। হাঁচি টিকটিকিটা ঠিক না মানলেও জন্মদিনে যাত্রা নাস্তি কিংবা শনি মঙ্গলবারটা মেনে চলার চেষ্টা করত কুমতি দেবী। তাই নিয়ে সুমতি দেবী ছাড়ত না টিকাটিপ্পনি করতে, এই যে গিন্নীর পঞ্জিকা দর্শন হল?

এবার কুমতির পালা, ওদের মাহাত্ম্য তুই কি বুঝবি রে দর্দুরের ডাক্তার ?

এমনি খুনসুটি লেগেই থাকত ওদের সংসারে।

একসময় কপটক্রোধে বললাম, স্বর্গে গেলেও দেখছি ঢেঁকির ধানভানা আর বন্ধ হয় না। সাধে কি বলে, পথি নারী বিবর্জিতা। এবার দুজনের সাধারণ স্বার্থে আঘাত লেগেছে। তাই নারীত্বের অবমাননায় দুজনের ভেতর একটা প্যাক্ট হয়ে গেল।

সুমতি গম্ভীর হয়ে বললে, তোমাদের কবিই ত বলে গেছেন—

'রমণীর মন
সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন।'

অতএব রমণীকে হেয় করা কাব্যশাস্ত্র বিরোধী।

বললাম, তোমার ঐ সঙ্গীনমুখী মনের খোঁচা খাবার জন্যে কোন ভাগ্যবান যে তপস্যা করছে তাই ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি।

কুমতি অমনি বলে উঠল, নিশ্চয়ই সে ভাগ্যবানটি কোন এক মেডিক্যাল-সুন্দর।

প্যাক্ট ভেঙে গেল। সক্রোধে সুমতি তাকাল কুমতির দিকে। নব-প্রলয়ের ইঙ্গিত বুঝেই বললাম, এবার কৃপা করে তোমাদের লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন হোক—উদর যে আমচুরের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

খাবার কথায় চাপা পড়ল অন্যসব প্রসঙ্গ। দুজনেই এবার ত্বরিৎকর্মা। আমার ভাগে মাত্রাধিক্য দেখে বললাম, সমানভাবে বণ্টনের নীতি গ্রহণ কর, নাহলে কি সমাজ, কি সংসার সব জায়গাতেই ভাঙন ধরবার সম্ভাবনা। তাছাড়া এত খেলে শেষটায় যে পীড়িত হয়ে পড়ব বলে মনে হচ্ছে।

মাসতুতো বোনটি একটা মালপোতে কামড় দিতে দিতে বললে, কুমতি হতে পারি, তা বলে পরিমাণে বেশী দিয়ে তোমায়

অসুখে বিসুখে ফেলব এধরণের কুমতলব অন্ততঃ আমার নেই।

সুমতি বললে, আর যদি তেমন কিছু হয় তাহলেও জেনো—

কিছু নাহি ভয়, নিঃসংশয়
ডাক্তার বাঁধা দোরে।

অতএব মহাশয়, প্রাণভরে উদরটিকে পূর্ণ করে যাও।

খাওয়ার পাট চুকলো একসময়। এদিকে দেব জনার্দন তুষ্ট হয়ে স্বধামে প্রস্থান করতে না করতেই পদ্মনাভের গোপন পদধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল।

কুমতি আর সুমতিতে একটি বেঞ্চ দখল করে রেখেছিল। তারই ভেতর তারা মাথায় মাথা ঠেকিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করে নিলে।

বললাম, দেখো আবার চুলোচুলি যেন না হয়।

কুমতি বললে, দোহাই তোমার দাদা, ঘুমন্ত প্রাণীদের বিনুনীতে যেন আবার গেরো দিয়ে দিও না।

কিছুক্ষণের ভেতর ওরা ঘুমাল, পাড়াও জুড়াল বলে মনে হল। এতক্ষণ যাঁরা ঘুমোবার চেষ্টা করেও পারছিলেন না দুটি বোনের কলকলানিতে, তাঁরা একে একে চোখের কপাট বন্ধ করতে লাগলেন। বাঙ্কের ওপর দেখলাম নাগমশায় জেগে আছেন। হাওড়ায় ভদ্রলোক ঝগড়া করছিলেন কুলীর সঙ্গে। খুব সাবধানী লোক, তাই গাড়ী ছাড়বার পাক্কা দুটি ঘণ্টা আগে থেকেই বিরাট লটবহর, বিপুলা পত্নী আর বিশীর্ণ এক কুলীকে নিয়ে বসেছিলেন প্ল্যাটফরমে। কুলীকে সম্ভবতঃ খুশী করে দেবার একটা প্রস্তাবও তিনি করেছিলেন, নইলে দুটি ঘণ্টা আগে থেকে বেচারী বা ঠায় বসে থাকতে যাবে কেন। অবশেষে বহু ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তির পর তাঁর লটবহর গাড়ীতে যথাস্থানে উঠল। পত্নী

গাড়ীর এক কোণে মনোমত আশ্রয় পেলেন, আর নাগমশায় স্বয়ং লাফ দিয়ে মঞ্চারোহণ করে সাময়িকভাবে দেহকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করে পড়ে রইলেন। এরপর বিদায়ের পালা, অর্থাৎ এতক্ষণ যে কুলিটি বিপুল ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছিল এখন সে ফল প্রাপ্তির আশায় হাত পাতল। নাগমশায় ত্বরিতে ব্যাগ খুলে তার হাতে একটি চকচকে সিকি ফেলে দিলেন। প্রায় উচ্চিংড়ের মত লাফ দিয়ে উঠল কুলীটি। শুরু হল বচসা। কুলী যত চেঁচায়, নাগমশায় ততোধিক। মুখেমুখে রেলওয়ে আইন বইএর পাতা ওল্টান। আবার কথাকে ঝাঁঝাল করবার জন্য মাঝে মধ্যে ইংরাজী বুলিও ঝাড়েন। সে এক দৃশ্য। অবশেষে আমার বন্ধুদের মধ্যস্থতায় আট আনায় রফা হল। বেচারা কুলী গজরাতে গজরাতে চলে গেল। এমন অবিস্মরণীয় হিসেবী লোকটির নাম জেনে নিলেন বন্ধুরা। শেষে যাবার সময় বন্ধুরা মজা করে ঐ সাংঘাতিক সংসারী মানুষটিকে লেলিয়ে দিলেন আমাদের দিকে।

বিনয় বললে, মশায়, আমার বন্ধুটিকে বড় সাবধানী লোক জানবেন, প্রয়োজনে আপনি ওঁর কাছে সবরকমের সাহায্যই নেবেন।

বিনয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু কিছু বলার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ীর সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে তপন চেঁচিয়ে বলতে লাগল, দেখো ভদ্রলোক যেন পথেঘাটে বিপন্ন না হয়ে পড়েন, ওঁকে সাহায্য করতে ভুলো না।

সত্যি এমন বিপজ্জনকও হয় বন্ধুরা। শেষে নাগমশায় ঐ সিংহাসনের ওপর থেকেই সারমন দিলেন, মশায়, দুজনে যাচ্ছি শ্রীক্ষেত্রে, তাহলে আর এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন। পরস্পরকে সাহায্য করাটাই ত মানুষের অবশ্য কর্তব্য—কি বলেন?

কি আর বলি। আর মুখ ঠেলে যে শব্দ ব্রহ্মটি বেরিয়ে আসতে চাইছে, তাকে ছেড়ে দিলেই একটা প্রলয় ঘটে যাবে, তাই মনের ক্ষোভ মনে চেপে শুধু মাথাটাই নাড়লাম।

নাগমশায় নিরাসক্তভাবে ঘুমন্ত যাত্রীদের ওপর দৃষ্টি বুলোচ্ছেন। নীচে বসে শ্রীমতী নাগিনীদেবী বক্র কটাক্ষে স্বামীর দৃষ্টির গতিবিধি পরীক্ষা করে চলেছেন। এই পরিবেশ থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে তাকে মেলে দিলাম জানালার বাইরে। চাঁদের হাসি সত্যিই আজ বাঁধ ভেঙেছে। আড়াল আবডাল যেন কিছুই আর রইল না। ঐ ত বাঁধের ধারে নয়নজুলিতে শালুক ফুল ফুটে আছে। এই ত ছোট্ট একটা বাঁশের সাঁকো এগিয়ে এল, ওপারে কৃষকের কুঁড়ে ঘরটি। পুরোনো খড়গুলো ধূসর হয়ে উঠেছে, চাঁদের জলে নাইছে বলে মনে হচ্ছে না! আরে এত রাতে গরু একটা চুপচাপ বাঁধের ধারে দাঁড়িয়ে করছে কি। পথ হারিয়েছে বুঝি। তা কেন হবে, এমন চাঁদের আলো আর ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ার মায়া কাটিয়ে নোংরা গোহালে ঢুকতে যাবেই বা কে!

এই যে এল আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো। জটিল জটা আর এক মুখ দাড়ির ঝুরি নামিয়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছে যেন বটগাছটি। মাথায় ও কি, কাকের বাসা বকের বাসা। ঝিক্‌মিক ঝিক্‌মিক, এক ঝাঁক আলোর সারি। যেন একছড়া মালা গেরো দেবার অপেক্ষায় রয়েছে। কি একটা স্টেশন ডিগবাজী খেয়ে পেছু হটে গেল। এবার গাড়ীর ভেতর তাকালাম। গাড়ীর দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে দুলছে সারা কামরাটা, দুলছে সহযাত্রী আর যাত্রিনীরা। পদ্মনাভ কৃপা করেছেন নাগ মশায়কে। ওদিকে কামরার কোণে নাগিনীর নাসা-রাগিণী শোনা যাচ্ছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে দুটি বোন। সারাদিন ধরে দুজনার লেগেই আছে খুনসুটি। কথা কাটাকাটিতে দুজনেই লক্ষ্মী সরস্বতী। তবু খাওয়া শোওয়া আর সিনেমা দেখার ব্যাপারে একজাতি একপ্রাণ একতা। দাদু একদিন বললেন, লক্ষ্মী সরস্বতীর বিয়েটাও যাতে এক বরেই হয় তার ব্যবস্থা দেখছি। অমনি কুমতি ঢিপ করে একটা পেন্নাম ঠুকে দাদুর ডান হাতটা ধরে বললে, আমি তোমার সরস্বতী। সুমতি গলায় আঁচল জড়িয়ে আর এক পেন্নাম

ঠুকে বললে, এই যে আমি তোমার লক্ষ্মী। এমন নারায়ণ ঘরে থাকতে অন্য পুরুষের চিন্তা—আরে রামো, রামো।

দাদু হেসে বললেন, তোমাদের নির্বাচনে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি, এখন বর প্রার্থনা কর। আচ্ছা, আসছে পূজোয় তোমাদের যা ইচ্ছে তাই চাইবে। আর তাই হবে বুড়ো বরের প্রেমোপহার।

কুমতি অমনি বলে বসল, জান তো সরস্বতী বীণাবাদিনী, আমার এস্রাজটা অচল হয়ে গেছে—একটা নতুন এস্রাজ চাই।

সুমতি বললে, সময় জ্ঞান না থাকলে কারু পক্ষেই লক্ষ্মী লাভ সম্ভব নয়। এদিকে স্বয়ং লক্ষ্মীর ঘড়িটিই স্ট্রাইক করে বসে আছে, অতএব একটি নবতম ঘড়ির আজ্ঞা হয় নাথ।

দাদু হাত তুলে বললেন, তথাস্তু। পরে স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে বললেন, তবে তরুণী ভার্যাদের খাঁই মেটাতে এ বুড়ো নারায়ণকে আবার ডালহৌসী স্কোয়ারের ট্রাম ধরতে না ছুটতে হয়।

সত্যি, এমন কলহাসিনী কন্যা ঘরে না থাকলে অনেক আলো-জ্বলা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

আবার চোখ গিয়ে পড়ল ট্রেনের বাইরে। এবার আকাশের দিকে তাকালাম। নীলকান্ত মণির মত নীলাকাশ। নিদ্রাহারা শশী একা স্বপ্ন পারাবারের খেয়া চালিয়ে যাচ্ছে। চলতি ট্রেণে বসে পৃথিবীর মানুষটি তার সাক্ষী হয়ে আছি। ভোর ভ্রমে কয়েকটা পাখি ডেকে উঠল পাশের একটা লতাপাতায় জড়ানো ঝুপসি গাছের আড়াল থেকে। ট্রেণ একটানা কিছুক্ষণ হুইসিল দিলে, যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তু কিসের তাড়া খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল। এবার ট্রেণের গতি মন্থর হয়ে এল। দুলুনি ধীরে ধীরে কমে আসতেই দু একটি যাত্রী শয্যা ছেড়ে কাৎ হয়ে উঠে বসে জানালার বাইরে তাকাল। কে যেন জিজ্ঞেস করলে, কোন স্টেশন?

জবাব দিলে অন্যজন—বালেশ্বর।

মাথার ওপরের বাঙ্ক থেকে একটি ছোকরা সার্কাসের কসরতিতে ছুটো হাতের ওপর ভর রেখে একবার দোল খেয়ে ঝুপ করে নীচে নেমে পড়ল। তারপর পায়ে চটিজোড়া ঢুকিয়ে ফটাস ফটাস আওয়াজ তুলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। কিছুপরে বেরিয়ে এসে পকেট থেকে চিরুনীটা বার করলো, তারপর মুখ আর ঘাড়ের সঙ্গে কয়েক ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে চুলে লম্বা লম্বা ছু তিনটে টান মেরে নিলে। নাগমশায় এখনও অচেতন। নাগিনী দেবীরও সেই অবস্থা তবে নাসিকার ধ্বনিটা থেমে গেছে।

সিঙাড়া, পুরী, মেঠাই।

এ্যায়, সিঙাড়ার দাম কত? ছেলেটি ততক্ষণে জানালা গলিয়ে দেহটাকে বুক অবধি ঠেলে বের করে দিয়েছে।

এক আনা।

চারটে সিঙাড়া—ঝটপট। দোকানী ঠোঙায় সিঙাড়া তুলতে আরম্ভ করতেই ছেলেটি মত পরিবর্তন করল।

আচ্ছা সিঙাড়া থাক, পুরী দাও ছ'ঠো; তরকারী হ্যায়?

লোকটি কথা না বলে আর একটা ঠোঙায় পুরী আর তার ওপর ছু' চামচে ঘ্যাঁটের ফোঁটার মত কি একটা পদার্থ তুলে দিয়ে দিলে ছোকরার হাতে।

একটা পুরীতে খানিকটা তরকারী লেপটে মুখে যেই চালান করেছে অমনি এক কাণ্ড। মুখ বিকৃত করে জানালার বাইরে চর্বিত পদার্থটিকে ফেলে দিতে আর তর সয় না। তার পর মুহূর্তে এক দর্শনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। ঠোঙার সেই তরকারী মাখা পুরীগুলো ছোকরা ছুঁড়ে মারলে খাবারওলার মাথায়। একেবারে জবড় জং কাণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে একদমে অভিধান বহির্ভূত কতকগুলো গরম বুলিতে আপ্যায়ন করে দোকানীর চৌদ্দপুরুষকে উদ্ধার করতে

লাগল। সে বেচারী হকচকিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সেখান থেকে বিনা প্রতিবাদে সরে পড়ল। অমনি ছেলেটি কামরার ভেতর মুখ ফিরিয়ে বললে, আরে মশায়, একেবারে ডাকাত যে, কতদিনের পচা মালগুলোকে গছিয়ে দিয়ে পয়সাগুলো মেরে বেরিয়ে গেল।

নাগমশায় ততক্ষণে বাঙ্কের ওপর উঠে বসেছেন। বললেন, রিপোর্ট করুন মশায়, রিপোর্ট করুন। ব্যাটাদের জোচ্চুরিতে যাত্রীরা একেবারে ধনে প্রাণে মরতে বসেছে। আর তাছাড়া মশায় আগেভাগে দাম দেওয়া কেন, জিনিষটা খাঁটি কিনা পরীক্ষা করে দেখুন, পরে দাম দিন।

ততক্ষণে ভাগ্যদেবী যে নাগমশায়ের অলক্ষ্যে থেকে মুখ টিপে হাসছিলেন তা টের পাওয়া গেল পরের একটি স্টেশনে।

গাড়ী থামতেই নাগ-পত্নীর তাম্বুল চর্বণের অদম্য ইচ্ছেটা চাড়া দিয়ে উঠল। ডাক হাঁক করে তিনি পতিদেবতাকে বাঙ্কের ওপর থেকে মেঝেতে নামালেন। এরপর নাগমশায় গলা বাড়িয়ে, পানওলা—এ্যায় পানওলা বলে ডাক হাঁক জুড়ে দিলেন। কাছে পিঠে কোন পানওয়ালার পাত্তাই পাওয়া গেল না।

ট্রেনের ঘণ্টা বাজল আর অমনি শ্রীমতী নাগিনীর বরাতগুণে এক পানওলা কোত্থেকে এসে হাজির।

নাগমশায় বললেন, পানের খিলি কত করে হে ?

দু' পইসা।

এ্যাঁ! কপালে চোখ তুললেন নাগমশায়, পান খেয়ে আর কাজ নেই, গিন্নীর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন।

দেখলাম নাগিনী ফণা উদ্যত করছেন। তাঁকে আর আক্রমণের সুযোগ না দিয়েই নাগমশায় বললেন, চারটে পান।

গাড়ী চলতে শুরু করেছে। পানওলা চারটে সাজা পান বের করে দিয়ে বললে, পইসা।

নাগমশায় একটা আধুলি বের করে তার হাতে দিয়ে চেঞ্জ নেবার জন্যে হাত পাতলেন।

নাগিনীদেবী চেঁচালেন, একেবারে পানের পাতা, সুপুরিটুপুরি কিচ্ছু নেই।

খানিকটা সুপুরি আর কতকগুলো রেজকি গুঁজে দিলে পানওলা নাগ মশায়ের হাতে। গাড়ী বেরিয়ে গেল স্টেশন ছেড়ে।

নাগ সুপুরীগুলো গৃহিনীর হাতে চালান করে রেজকী মেলাতে লাগলেন। এঁ্যা, এ যে তিন আনা, আমি যে পাই ছ'আনা। প্রায় চেন টেনে ট্রেন থামাতে যান আর কি নাগমশায়। অনেক কষ্টে তাঁকে এই দুষ্কর্মটি থেকে নিবৃত্ত করা গেল।

এবার পুরো ক্রোধটুকু গিয়ে পড়ল সহধর্মিনীর ওপর। উভয়ের কলরবে অচিরেই কামরাটি একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হল। নাগ-মশায়ের সাংসারিক জীবনের সুখ দুঃখের বহু গুপ্তকথা সেদিন আমাদের মত অপরিচিত কয়টি যাত্রীর জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এক সময় নাগমশায় গলা নামাতে বাধ্য হলেন। নাগিনী দেবীর নয়নযুগল বিদ্যুৎ বিকাশের পর আসন্ন বর্ষণের আভাস দিচ্ছিল। পরে সক্রোধে তিনি হাতের পানগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মুখের পানটিতে বোধকরি খয়েরের পরিমাণ কিছু বেশীই অনুভব করে থাকবেন, তাই সেটিও থুৎকারে বের করে দিলেন বাইরে।

মুখে কাপড় দিয়ে হাসছিল কুমতি। চোখ ইসারায় ওকে থামিয়ে দিলাম। এ যে পরিবেশ একটা কিছু অঘটন ঘটতে কতক্ষণ।

শেষরাতের দিকে কিন্তু নাগ নাগিনীর মনোমালিন্য অপ্রত্যাশিত-ভাবে কেটে গেল।

একটা স্টেশনে গাড়ি থেমেছিল, চলতে আরম্ভ করতেই একটি

তরুণ আর একটি তরুণী উঠে পড়ল। এই রে, তুজনের পায়ে তুটো ঘুঙুর বাঁধা। ভাল করে দেখলাম তুটিই তরুণ, একটি কেবল তরুণী সেজেছে।

এবার ঝমর ঝম্ ঘুঙুরের বোল উঠল, সঙ্গে সঙ্গে গান। রাধা-কৃষ্ণের লীলা সংগীত জুড়ে দিয়েছে।

বংশীধারী জান মুরলীধারী জান
প্রাণনাথ মোর
মুরলী ভাঙিলা সবু গুমান রে—সজনী
গুরু গুরুজন কথা প্রমাণ
যেতে মু করিলি আশা বরণ রে—সজনী

এমনি করে কৃষ্ণের জন্য রাধার তুঃখবরণের ইতিহাস বলে গেলেন শ্রীমতী রাধিকা।

কৃষ্ণও গানের ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে প্রত্যুত্তর দিয়ে চললেন ; যার মর্মার্থ হল, শ্রীমতী রাধিকার প্রতি তাঁর দরদের অন্ত নেই, তিনি নিতান্ত নিরুপায় হয়েই মথুরায় এসেছেন, নইলে রাজকার্যে তাঁর একটুও মন বসে না। মন তাঁর পড়ে আছে সেই গোকুলের পথে ঘাটে আর যমুনার তটে, যেখানে রাধার সঙ্গে রোজ তাঁর দেখা হত। নানারকম অঙ্গভঙ্গী সহ নাচিয়ে তুটি রাধাকৃষ্ণের মনোভাব প্রকাশ করতে লাগল। নাগপত্নী মনে হল খুব একটা মজা পেয়েছেন। উড়িয়া ভাষার গান শুনে আর নাচিয়েদের অঙ্গভঙ্গী দেখে তিনি ত হেসেই কুটিপাটি। বাঙ্কের ওপর থেকে নাগ কর্তা দেখলেন, সন্ধির এই হল সুবর্ণসুযোগ। তাই একটি গান শেষ হতেই বাহবা যোগে আর একটির ফরমায়েস করলেন পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য।

নাচিয়ে তুটি বোধ করি পরের স্টেশনে নেবে যাবে তাই একজন সামান্য আপত্তি তুললে, আমে ওলেই যিবু।

অন্যটি বখশিষের আশায় বললে, বাবু কহুছন্তি আউ গটিয়ে গীত কর।

আবার গান আর ঘুঙুর বাদ্য চলল কিছুক্ষণ। সুমতি কুমতি দেখলাম জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। জানি, এ পরিবেশকে ওরা কোনরকমেই বরদাস্ত করতে পারছে না। গাড়ীর বেগ কমে এল। কিমাশ্চর্যম্, গান শেষ হতে না হতেই এমন সংগীত-প্রিয় নাগ মশায় বাঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়লেন বাথরুমে। গাড়ী থামল, কিন্তু নাগমশায় কই। দু'মিনিট পাঁচমিনিট কেটে গেল, নাগমশায় আর বেরোন না। নাচিয়েরা অসহায়ের মত তাকাতে লাগল এদিক ওদিক। সকলেই এখন নিস্পৃহ। নাগ-গিন্নীর কৌতূহল এতক্ষণে গিয়ে পড়েছে জানালার বাইরে স্টেশনের লাইটপোস্টের ওপর।

এরপর কোন একটা বিহিত করতেই হয়, নাহলে হয়ত ওড্র নন্দনদুটি আরও এক স্টেশন জ্বালাবে; আর বেচারা নাগমশায়ের তাহলে অন্ততঃ আধ ঘণ্টাখানেক বাথরুমে আটকে থাকতে হবে।

এই যে নাও, পকেট থেকে কয়েক আনা পয়সা নিয়ে প্রাণের দায়ে ওদের হাতে ফেলে দিলাম। ওরা নেমে গেল প্ল্যাটফরমে। গাড়ী ছাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন নাগমশায়ও।

কি মশায়, কত দিলেন? যেন ওঁর অনুপস্থিতির সুযোগে ওরা আমায় ঠকিয়ে নিয়ে গেছে।

ইচ্ছে করছিল না লোকটির সঙ্গে কথা বলি। তবু বললাম, যা হোক কিছু।

এইত আপনাদের দোষ, গণ্ডাআষ্টেক পয়সা দিলেই হয় যেখানে সেখানে হয়ত তার দ্বিগুণ দিয়ে বসে আছেন। এমনি করে খাঁই বাড়াচ্ছেন ওদের।

চুপ করে বসে রইলাম। মনে মনে শুধু বললাম, গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দেবার পাত্র বটে তুমি।

ট্রেণের রাতজাগা বাতি নিভল, আর অমনি বাইরে ফুটে উঠল একটি স্নিগ্ধ নীলাভ আলো। সারা প্রান্তর জলস্থল নভোস্থলী ছেয়ে সে কি অপরূপ শান্তির প্রবাহ। ঠাণ্ডা বাতাস বইল। কেঁপে উঠল গাছের পাতা। নয়নজুলীতে রেশমী রুলির মত জাগল জল-বলয়। পাখি ডাকল, ঘুমভাঙা কলরব, শুরু হল ভোরের ভৈঁরো। ট্রেণ আমাদের কিছুক্ষণ সেই নীল মায়াময় জগতের ভেতর দিয়ে নিয়ে চলল। এই যে মহানদী। প্রভাতের পবিত্র প্রসন্ন সলিলে অবগাহন করতে নেমেছে স্নানার্থীর দল।

সারা রাতের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। মন ভরে নেমে এল এক অপূর্ব স্নিগ্ধতা।

মত পরিবর্তন করলাম। নাগের সঙ্গ ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছিল। এরপরও একসঙ্গে পুরীতে নামলে ভাগ্যদেবতা আমার কপালে আরও যে কি দুর্ভোগ চাপাবেন তা ভেবে আতঙ্কিত হলাম। তার চেয়ে টিকিটের কয়েকটা টাকা ক্ষতি স্বীকার করে কটক স্টেশনে নেমে পড়া অনেক নিরাপদ। ভগ্নী দুটিকে সংগোপনে অভিলাষটি জানাতেই সম্মতি পাওয়া গেল।

স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। দেখলাম নাগমশায় বাঙ্কের ওপর ভোরের নিদ্রাসুখ উপভোগ করছেন। নিদ্রায় ব্যাঘাত যাতে না ঘটে সেজন্য হাত ইসারায় একটা কুলিকে ডেকে তার মাথায় লটবহর চাপিয়ে তিনজন পায়ে পায়ে নেমে এলাম। নাগিনী আমাদের কাণ্ড দেখে সবিস্ময়ে বললেন, এখানে ত আপনাদের নামবার কথা ছিল না। আহা একা মানুষ উনি, এতগুলো তোরঙ্গ প্যাঁটরা সামলাবেনই বা কেমন করে। আপনাদের ওপরই যা ভরসা ছিল।

প্ল্যাটফরমের বাইরে থেকে সুমতি বললে, কটকে আমার এক

বন্ধু রয়েছেন কিনা, তাঁর সঙ্গে আবার দেখা না করে গেলেই নয়, কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল তাই।

কুমতি বললে, আমাদের সিটটাতে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসুন, আরাম পাবেন, সারারাত যেভাবে কেটেছে আপনার।

নাগগিন্নী এই দুঃসংবাদটি পতিদেবকে জ্ঞাপন করবার জন্য ডাকহাঁক আরম্ভ করলেন। বাধা দিয়ে বললাম, থাক্ থাক্, সারারাত্তির জেগে ভোররাতে একটু ঘুমিয়েছেন, ওঁকে আর জাগিয়ে কাজ কি। ঘুম ভাঙতে ভাঙতেই পুরী পৌঁছে যাবেন।

নাগিনী কটাক্ষপাত করলেন। আমরাও যথা সম্ভব সত্বর তাঁর দৃষ্টির আড়ালে সরে গেলাম। কুমতি বললে, দাদা, আমাদের ত্র্যহস্পর্শ দোষটা কাটল বুঝি এতক্ষণে।

॥ যাত্রাভঙ্গ ॥

যে জায়গায় নামার কথা নয় হঠাৎ কোন কারণে সেখানে নেমে পড়ার ভেতর কেমন এক রোমাঞ্চ আছে। গন্তব্যস্থানের সম্বন্ধে আগে ভাগেই কিছুটা ওয়াকেবহাল হতে হয়, আর কিছু পরিমাণ কল্পনাও তার পেছনে কাজ করতে থাকে, তাই সে জায়গাকে একেবারে অচেনা বলা যায় না। কিন্তু এই যে আগেভাগে ভাবা নেই, তৈরী নেই হঠাৎ একটা জায়গায় নেমে পড়লাম, এর ভেতর দিব্যি একটা অপরিচয়ের আনন্দ আছে। কটকে ত এমনি করে নামা গেল, এখন চল চল চল। আগে ঠিক কর আস্তানা, তারপর ঘুরে বেড়াও মন যেখানে নিয়ে যায়। অতএব আস্তানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে আর পড়ব কোথায়। সহরের চওড়া রাস্তার ওপর দিয়ে দুখানা সাইকেল রিক্সা আমাদের নিয়ে চলল একটা ভাল হোটেলের দিকে। বাঁয়ে পড়ল রেভেনসা কলেজ। ছোট একটি ছেলে তার চেয়ে বড় একখানা কাপড় পরে তার একটা অংশ কোমরে জড়িয়ে বোধহয় স্কুলে চলেছে। হঠাৎ মনটা সামনের থেকে পেছু হটে পেরিয়ে গেল কয়েকটা বছর। কটকের গভর্ণমেণ্ট প্লীডার জানকীনাথ ডাক দিলেন, কোথায় যাচ্ছ সুভাষ ?

—স্কুলে বাবা।

—কিন্তু এমন ধুতি আর জামা পরে যাচ্ছ কেন, তোমার কোট প্যাণ্ট কই ? তাছাড়া ঐ পোষাকে ত তোমায় মানাচ্ছে না।

ছেলে জবাব দিলে, স্কুলের সব ছেলেরাই ধুতি জামা পরে

আসে, আমি শুধু শুধু সাহেবী পোষাক পরতে যাব কেন? তাছাড়া আমি ভারতীয় বাবা, ঐ পোষাক পরতেই আমি খুব আনন্দ পাই।

আমাদের নেতাজী সুভাষচন্দ্র এমনি একটি শিশু মূর্তিতে হেঁটে গেছেন এই পথের ওপর দিয়ে। ছোট ছেলেটিকে পেছু ফেলে রিক্‌সা এগিয়ে চলল। সহরের বাড়ীঘর ছাড়িয়ে আমরা যাচ্ছি ত যাচ্ছি। কোথায় হোটেল, কোথায় কি! একদিকে মাঠ গৃহস্থালি, তার মাঝ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা ধরে গাড়ী চলেছে। মনে হল তু'মাইল চলে এলাম। এবার গাড়ী ঢুকল পুরানো টাউনে। ধুলি-ধুসর পথ। তুদিকে দোকান পাট। পথ ছোট, অাঁকাবাঁকা। দরদালান বাড়ীঘর। লোক গিস গিস। রিক্‌সা তুটো লেফট রাইট অনেক অাঁকবাঁক মেরে একটি চওড়া প্রাচীন পথের ধারে কয়েক সারি বাড়ীর একটি বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। হোটেলের নামটা আর নাই বা করলাম। ভদ্রলোক মালিকের ভাত মেরে আর লাভ কি। বিদেশে বাঙালী ভদ্র, সুতরাং অন্যের সামান্যতম ক্ষতি করবার প্রবৃত্তিটুকু সংবরণ করাই ভাল। হোটেলের মালিক এগিয়ে এসে স্বাগতম্ জানালেন। ডেরায় ঢুকেই কিন্তু মনটা পুলকিত হয়ে উঠল না। বুঝলাম রিকসাওয়ালা আমাদের ঠকিয়েছে। স্টেশন থেকে এতদূরে এমনি এক হোটেলে নিয়ে আসার অর্থ দূরত্বের জন্যে দ্বিগুণ দক্ষিণা আদায় করা। সে যা হোক, আপাততঃ রাত-জাগার ক্লান্তিতে প্রায় অবশাঙ্গ। তাই নীচের একটা স্যাঁৎসেতে ঘরে, যা পাওয়া গেছে তাই সই করে হোল্ডল খুলে কাৎ হলাম। সুমতি বাগড়া দিলে, ওসব চলবে না, নোংরা সাজ-পোষাক ছেড়ে হাতমুখ ধোও, কিছু খেয়ে নাও, তারপর যা ইচ্ছে তাই করো।

মুখে সকরুণতা ফুটে উঠলেও সব কাজগুলি এক এক করে করতে হল। আর এই সত্যটি উপলব্ধি করলাম যে পুরোনো

চিকিৎসকের চেয়ে নবীন শিক্ষার্থীর কারণে অকারণে সাবধানতা অনেক বেশী।

মাথাপিছু চার টাকা হোটেল চার্জ। তার ওপর একসঙ্গে তিনটি শীকার। অতএব হোটেলের মালিকের পক্ষে খুশি না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। ভদ্রলোক একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন, তবু কষ্ট করে এলেন আমাদের ঘরের সামনে। বলে গেলেন, নিরিমিষ, আমিষ অর্থাৎ মাছ মাংস যা চাই তাই দেবেন তিনি আমাদের পাতে। থাকার ক্ষোভটা খাওয়ায় মিটবে জেনে আপাততঃ আশ্বস্ত হওয়া গেল। অতঃ কিম্। শাস্ত্রকারেরা দিবানিদ্রার গুণকীর্তন যেমন করেননি, স্বাস্থ্যবিধিতে তেমনি রাত্রি জাগরণের সুফল সম্বন্ধেও কিছু লেখেনি। সুতরাং রাত্রে যদি স্বাস্থ্যনীতি লঙ্ঘন করা যায় তাহলে শাস্ত্রকারদের হিতোপদেশের দিকে চোখ না দিয়ে চোখের পাতা প্রয়োজনবোধে দিনের বেলা বন্ধ করা চলতে পারে। কখন এইসব আগডুম বাগডুম ভাবতে ভাবতে চোখ বুজলাম। কিছুক্ষণ মাথার ভেতর রাতের ট্রেনটা ঝিক্ ঝিক্ ঝক্ ঝক্ করে চলতে লাগল। তারপর একেবারে স্বপ্নের দেশে চলে গেলাম। কতক্ষণ এ্যালিসের মত ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে ঘুরেছিলাম ঠিক মনে নেই। এক সময় কুমতির কলরবে স্বপ্ন ভঙ্গ হল। উঠে দেখি দুটি ভগ্নীতে লুডো খেলছেন। কুমতির পাকা ঘুঁটিটা কেঁচে গেছে সুমতির দানে। তাই এই হৃদয়বিদারী আর্তনাদ।

নাঃ, নিজেরাও ঘুমুবে না আর ঘুমুতেও দেবে না কাউকে; কপট উষ্মা প্রকাশ করলাম। বয়েই গেছে ওদের ভয় পেতে। বরং এমন করে আমার দিকে তাকাল যেন ওদের খেলায় আমি কথা বলে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি। অগত্যা অলস অনাসক্ত চোখে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ ওদের বোর্ডের দিকে। ঘুঁটিগুলো চলছে একটা অন্যটাকে ডিঙিয়ে। বাগে পেলে ঘাড়ে ধরে পাঠাচ্ছে খোয়াড়ে। পুনর্মুষিকো ভব। ছক্কা ফেল তবে ছাড়পত্র পাবে বেরুবার।

কখন নিজেও মজে গেছি খেলায় টের পাইনি। সত্যি, খেলা দেখা নয়, একটা সংক্রামক রোগে পড়া। ইতিমধ্যে একটি পক্ষও অবলম্বন করে ফেলেছি। ঘুঁটির মরণ বাঁচন তখন প্রায় নিজের মরণ বাঁচনের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ডাক এল ভোজনের। কে শোনে কার কথা। এমন একটা জয় পরাজয়ের মুহূর্তকে অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে সুস্থমনে মধ্যাহ্ন ভোজে বসা যায়! তবু যেতে হল। বয়ের ডাক উপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু স্বয়ং বাবুর ডাকে সাড়া দিতে হল। খাওয়ার সময় হোটেলের মালিক নতুন আগন্তুকদের সামনে এসে বসলেন।

হা-হতোহস্মি! প্রথমে থালার বাহার দেখেই পিলে চমকেছে। আমার অবশ্য সবেতেই অভ্যেস, আর কুমতিও কোনরকমে হয়ত চালিয়ে নিতে পারত কিন্তু সুমতি স্ট্রাইক করে বসল। এমন ময়লা এ্যালুমিনিয়মের থালায় খেলে ভোজ্যবস্তু তার স্বাভাবিক নিয়মে নীচের দিকে না গিয়ে উর্ধ্বমুখে অচিরে উঠে আসতে পারে। অতএব সমাধানের উপায় হিসেবে মালিককে বললাম, পাতা পাওয়া যাবে মশায়?

এমন একটা অঘটনের জন্য মালিক প্রস্তুত ছিলেন না। যাই হোক তখুনি তাঁরই নির্দেশে রাঁধুনি ছুটল বাজারে পাতার খোঁজে, আর আমরা হাত ধুয়ে বসে রইলাম।

এক সময় পাতা এল, শালের পাতা। সুমতি পাতাগুলো নিজের হাতে ধুয়ে আনলে। তারপর ভাত এল। লক্ষ্মীর রূপ বিচার করতে নেই, তাই আর অন্নের চেহারার বর্ণনা দিলাম না। কিন্তু তারপরে যে সব পদার্থ পাতে পড়তে লাগল তার পরিমাণ ও রূপ দেখে চক্ষু স্থির। বড়ির আকারে বেগুন-পোড়া। বলাই বাহুল্য, তা পাতের একপাশে অস্পৃশ্য হয়ে পড়ে রইল।

ডাল নয় তো মহানদীর জল। অবশ্য হোটেলের মালিক আগে আমাদের যে মেনু দিয়েছিলেন তার বিন্দুমাত্র খেলাপ

হয়নি। যথাকালে মাছমাংস এলো। তার পরিমাণ আর স্বাদের বর্ণনা নাই বা দিলাম। শুধু পাত ছেড়ে উঠে আসতে পেরেই কেমন একটা পরিতৃপ্তি পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকেই সুমতি বললে, দাদা বেডিং তোল।

বললাম, 'সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করিবে আশ
দুখ যাবে তার ঠাঁই।'

অতএব উল্টো দিক থেকে একটু যদি দুঃখ স্বীকার করতে পার তাহলে ওবেলাই সুখের মুখ দেখতে পাবে।

কুমতি বললে, কি রকম ?

বললাম, পাচিকা সাজতে হবে। স্টোভ যখন রয়েছে সঙ্গে আর ক্ষোভ জানিয়ে কাজ কি।

ওরা সানন্দে সম্মতি দিলে। কথা হল, সামান্য বিশ্রামের পর আমরা বেরুবো চারদিক ঘুরে দেখতে। ফেরার পথে বাজার নিয়ে একেবারে বাসায় এসে রান্না চাপাব।

হোটেলের মালিককে এই দুঃসংবাদটি জানাতে আর যাই হোক তাঁর মুখে যে ভাবটি ফুটে উঠল তাকে কোন মতেই প্রসন্নতা বলা চলে না। তবে যখন তাঁকে আভাস দিয়ে বললাম যে এ জন্যে তাঁর প্রাপ্য থেকে আমরা একটি কপর্দকও বাদ দিতে চাইছি না, তখন ভাবান্তর এল। এক মুখ হাসি ফুটিয়ে রাতের জন্য নতুন কিছু ব্যবস্থার কথা শোনালেন। কিন্তু তাঁর এই নতুন খাদ্যের আশ্বাসেও মনে ঠিক তেমন জোর পেলাম না, যাতে করে তাঁর বাক্যে আস্থা স্থাপন করা যেতে পারে।

দুপুরে কিছু সময় শোওয়াবসা করে বাইরে গেলাম রিক্‌সা ডেকে আনতে। রোদ্দুর প্রবল, এখন হেঁটে বেড়ান যাবে না। ঠিক হল রিক্‌সা আমাদের টাউনটা ঘুরিয়ে মহানদীর তীরে এনে ছেড়ে দেবে। তারপর ফেরার অন্য ব্যবস্থা হবে। কারণ রিক্‌সাকে

বসিয়ে রেখে নদীতীরের সৌন্দর্য-দর্শন একেবারে অসম্ভব। মন পড়ে রইবে সময়ের পেছনে। অনেক দেরী হয়ে গেল যা, রিক্‌সা-ওয়ালা আবার কি ভাবছে, এমনি সব ভাবনায় আনন্দের পুরোটাই মাটি। আগেভাগে একটা টাকার অঙ্ক ঠিক করে রিক্‌সায় ওঠা গেল। রিক্‌সা আগে ঢুকলো টাউনে।

এদিক ওদিক নোংরা কতকগুলি গলি ঘুঁজি। কোথাও কিতাব মহল, কোথাও আবার কাপড় পটি। জিলিপি ভাজা চলেছে মিষ্টির দোকানে। হুড়মুড় করে ভাঙা গলির রাস্তায় ঢুকে পড়ছে দুটো রিক্‌সা, কিছুদূর গিয়ে আবার আরোহীদের নির্দেশ মত ফিরে আসছে। লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে আমাদের এই যাওয়া আসা। নিজেরাই বুঝে উঠতে পারছি না, এ কিরকম উদ্ভট খেয়াল। অবশেষে রিক্‌সা অনেক পাক খেয়ে খেয়ে পাকা কাঁচা কতকগুলো বাড়ীর পাশ কাটিয়ে একটি প্রশস্ত রাস্তায় এসে পড়ল। সেই রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে আসতেই ডাইনে পড়ল একটা খোলা পড়ো জমি। কি ফুল এগুলো। মাটিতে গাছগুলো লতিয়ে গেছে, আর তার মাঝে মাঝে রঙের আগুন। গোলাপী ছোট ছোট ফুলের থোকা। নানা মক্ষিকার বিচিত্র পোষাক আর গোপন গুঞ্জনে আসর সরগরম। রিক্‌সা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একটি মন্দিরের সামনে। মন্দিরটি সাধারণ একটি গৃহের গঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন বৈশিষ্ট্য নেই। মন্দিরের প্রবেশপথে সিংহমূর্তি। দেয়ালে পদ্মের অলংকরণ, উড়িষ্যার বিশিষ্ট শিল্পরীতি। মহামায়ার বিগ্রহ রয়েছে এ মন্দিরে। পয়সা দিয়ে তিনটি দীপ কেনা হল। জ্বালিয়ে দিয়ে এলাম মন্দিরে। কটকে মন্দির আছে অনেকগুলি, কিন্তু কোনটিই শিল্প সমৃদ্ধ নয়। জুম্মা মসজিদ আর কদমরসুলের প্রাসাদগুলি মোগল সাম্রাজ্যের চিহ্ন বহন করছে। কটকে ইংরাজদের একটি চিহ্ন ফিরিঙ্গি বাজার। রোমানরা বৃটেন ছেড়ে চলে আসার সময় যেমন

কয়েকটা পথ আর গৃহে জিইয়ে রেখেছিল রোমান নাম, এও তেমনি।

এ বাড়ীটি কার? জিজ্ঞেস করলাম রিক্সাওয়ালাকে।

কর্ণিকা রাজার।

রিক্সা থেকে নামলাম। ঢুকেই সামনে মস্ত এক পুষ্করিণী। তার মাঝে সিমেন্ট বাঁধানো বেদী। জলক্রীড়ায় ক্লান্ত হলে পুষ্করিণীর মাঝে এই বেদীতে বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। পুষ্করিণীর চারদিকে সবুজে ঘেরা বাগান। রাজবাড়ী এমন দর্শনীয় কিছু নয়। প্রবেশপথের দেওয়ালে কতকগুলি বাঘ হরিণ আর মহিষমুণ্ডের যেন মিছিল চলেছে। কর্ণিকা রাজার শিকারী হিসেবে সুনাম আছে। এই প্রাণীমুণ্ডগুলি বোধকরি তারই পরিচয় বহন করছে। সেখান থেকে ফিরে এলাম। রিক্সা আমাদের নিয়ে চলল সুপ্রশস্ত পথের ওপর দিয়ে। ডাইনে বাঁয়ে গভর্ণমেন্ট অফিস, কোয়ার্টার।

ছোট্ট এক টুকরো বাগান। সবুজ সমারোহের ভেতর নীল লাল সাদা রঙের ফুলের বাহার।

গৃহকে যদি দেহরূপে কল্পনা করা যায় তাহলে সংলগ্ন উদ্যানটুকু তার মন। সত্যি, বাগান ছাড়া আবার ঘর হয় নাকি।

একা আরোহী, তাই আমার রিক্সাটি অগ্রগামী। পেছন থেকে ডাক শুনে রিক্সাওয়ালাকে থামতে বললাম। তাকিয়ে দেখি ওরা রিক্সা থেকে নামছে।

কি হল?

কুমতি বললে, এসো না এদিকে। উড়িষ্যা সরকারের শিল্প বিভাগ দেখছো না?

পথের ওপরে রিক্সাকে দাঁড়াতে বলে আমরা ঢুকলাম ভেতরে। সামনেই কয়েকটি শোরুম। কয়েকটি চারুদর্শনা কলিঙ্গ রমণী নানা ডিজাইনের শাড়ি পরে যেন আলাপচারীর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মনের মত খোরাক পেয়েছে দুটি বোন। ঘুরে ঘুরে বহুবর্ণে বোনা সেইসব শাড়ির ডিজাইন দেখতে লাগল। বাঃ, শাড়ির আঁচলা ভরে কি সুন্দর হাতি ঘোড়ার মিছিল চলেছে। একসার ঘট মাথায় মেয়েরা চলেছে পানিয়াভরণে।

বললাম, চল ভেতরে যাই।

যেতে কি চায়। চোখ একেবারে আটকে গেছে শাড়ির জমিনে।

সুমতি বললে, সত্যি দাদা, কি চমৎকার রঙ খুলেছে দেখ।

বললাম, ওতে আমার কি ইন্‌টারেস্ট বল। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের কি কোন দরকার আছে? যে বস্তু একান্ত স্বার্থপরের মত রমণী সমাজ আগলে রইলেন, তার ওপর অকারণ দৃষ্টিপাতের মানেই ত পুরুষত্বের অবমাননা। অতএব যেখানে তোমাদের একমাত্র অধিকার সেখানে আমার সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য।

কুমতি বললে, আচ্ছা ভাই, রাগ করোনা, ইচ্ছে যদি কর তাহলে আমি নিজের খরচায় তোমার জন্যে একটি কটকী শাড়ি কিনে দিতে প্রস্তুত আছি।

সুমতিও মাথা নেড়ে সায় দিলে। বললাম, আগে চল সেল্‌স রুমে ঢোকা যাক্, তারপর বিবেচনা করা যাবে তোমাদের প্রস্তাব।

ঢুকলাম ভেতরে। একটি হল ঘর, তার দুপাশে দুটি ছোট ঘর। হলঘরে বিচিত্র রঙ আর ডিজাইনের শাড়ি। মেয়েদের স্বাভাবিক কৌতূহলে পেয়ে বসল দুটিকে। বেচারা সেলসম্যানের অচিরেই মাথা খারাপ হবার জোগাড়। দেখি দেখি ঐ শাড়িটা, না না, ওটা নয়, ঐ যে ডানদিকের বেগুনী রঙেরটা। বেচারা বিক্রেতা অনেক কৌশলে কাপড়টা পেড়ে আনতেই দুজনে ঝুঁকে কাপড়ের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে লেগে গেল। দাম কত?

বিক্রেতা একটা দাম বলতে না বলতেই চোখ গিয়ে পড়ল অন্য এক থাক কাপড়ের ওপর। দেখি ঐ যে বাসন্তী রঙের খানা।

ধারণাটা ভুল হতে পারে, তবে জনান্তিকে একটা কথা বলি, মেয়েরা দোকানীকে যতটা বিব্রত করে তোলেন, ততটা কিনে কেটে পুষিয়ে দেন না। অবশেষে আমার ব্যবহারের জন্যে একটি তোয়ালে আর ওদের পছন্দ মত দুটো শাড়ি কেনা হল। কিন্তু এক বাণ্ডিল ইচ্ছেকে যে ওরা কটকের ঐ শাড়ির দোকানে রেখে এল তা আমি হলফ করে বলতে পারি। পারলে যেন সারা দোকানটা কোলকাতায় তুলে নিয়ে আসে। তবে 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না' তাই যা রক্ষে।

এবার ঢুকলাম বাঁ দিকের ঘরটাতে। বিছানার চাদর, দরজা জানালার পর্দায় সে ঘরখানা ভরে আছে। উড়িষ্যার এই সব জিনিষের চলন আজকাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খুব বেড়ে গেছে। আর সত্যি পছন্দ না করে উপায় নেই। আমার ধারণা

মন্দিরগাত্রে যে কলাবতী কন্যাদের বিচিত্র দেহভঙ্গিমা দেখা যায় তাদেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুকরণে বর্তমান উড়িষ্যার পুতুল শিল্পটি গড়ে উঠেছে।

একটি মৃদঙ্গবাদিনীর মূর্তি কেনা হল।

কুমতির পছন্দমত উমা-শঙ্করের একটি মূর্তিও নিতে হল। বিশেষভাবে দেখলাম উমার মুখখানিতে কি অপূর্ব মুগ্ধবোধের প্রকাশ। শঙ্কর সস্মিত আর উমা তৃপ্তিতে আত্মমগ্না। বেরিয়ে এলাম সেল্‌স রুম থেকে।

আবার রিক্‌সা চলল এপথ ওপথ ঘুরে।

এ বাড়ীগুলো? জিজ্ঞেস করলাম রিক্‌সাওয়ালাকে।

কটক হাসপাতাল।

থামাও রিক্‌সা।

রিক্‌সা থামল, সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও থামতে হল।

কি দাদা, এখানে নামলে যে? সুমতি জিজ্ঞেস করল।

বললাম, কটক হাসপাতালটা একটু দেখে যাই।

ডাক্তারদের আস্তানার ওপর তোমার আবার অনুরাগ জন্মাল কবে থেকে, সুমতি মন্তব্য করল।

ওরা দুজন আমার পেছন পেছন আসতে লাগল। এই পথে, এই হাসপাতাল প্রাঙ্গনে আজও কি কোন রক্তের চিহ্ন পাওয়া যাবে? সেদিন যে রক্তের বীজ থেকে সহস্র সহস্র জাতীয় সংগ্রামের সৈনিক জেগে উঠেছিল, বুড়িবালামের তীরে যে নির্ভীক যোদ্ধারা মরণ বরণ করল, আজ আমার মনের মন্দিরের দ্বার খুলে তারা বেরিয়ে আসছে একে একে। চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন, জ্যোতিশ, বাঘা যতীন।

ক্ষুধায় পিপাসায় ক্লান্ত কাতর যতীন্দ্রনাথ সংগ্রাম করে আহত হলেন; আর তাঁকে বয়ে নিয়ে এল বৃটিশ বাহিনী এই কটক

হাসপাতালে। শৃঙ্খল পরবার আগেই মুক্তি পেলেন বাঘা যতীন। মনের তারে গুঞ্জন উঠল—

'বাঙালীর রণ দেখে যা রে তোরা রাজপুত শিখ মারাঠী জাঁট,
বালাশোর বুড়িবালামের তীর, নবভারতের হলদিঘাট !'

উড়িষ্যার এই পুণ্যভূমির মাটি কপালে ছুঁইয়ে নিলাম।

রিক্‌সা এবার চলল মহানদীর পথ ধরে। কিছুক্ষণ চলার পর আমরা এসে পৌঁছলাম মহানদীর কূলে। একটি মন্দিরের কাছে রিক্‌সা আমাদের এনে ছেড়ে দিলে। দাম চুকিয়ে দিলাম। ওরা চলে গেল আর আমরা এসে বসলাম মন্দিরের পাশে একটি বনস্পতির ছায়ায়। দেখলাম মন্দির সংলগ্ন ভাঙা শ্যাওলাপড়া ঘাট। পূজার্থী বা স্নানার্থী কাউকেই দেখা গেল না।

ভরদুপুর, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথার ওপর। মহানদী এখন একেবারে সুশান্ত ধারা। কিছুদূরে নদীর বুকে চর জেগে আছে। নদীতীর-জাত কাশের বন অজস্র সাদা ফুলের ঢেউ তুলেছে। চরের বালুতে রোদ এসে পড়েছে, যেন একখণ্ড চিক্কণ রূপোর পাত। এতক্ষণে চোখ গিয়ে পড়ল একটা নৌকোর ওপর। বছর আটদশ বয়েসের দুটো ছেলে বোধ হয় ইস্কুল পালিয়ে নৌকো চালাচ্ছে মহানদীর বুকে। শান্ত মহানদী খল খল খুশিতে তাদের দুরন্তপনা সহ্য করছে।

'শান্ত নেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝটপটি।'

হুবহু সেই মধ্যাহ্ন লগ্ন আজ এসেছে যা রবীন্দ্রনাথ একদিন দেখেছিলেন জনহীন কোন নদীতীরে বসে।

ওদিকে একটা হাঁক ডাকের শব্দ শোনা গেল। দেখি মহানদীর

তীরে তীরে একটি লোক দৌড়ে আসছে। এদিকে এক কাণ্ড। নদী থেকে জোরে লগি ঠেলে সেই ছেলে দুটো নৌকোটাকে তাড়াতাড়ি কূলে ভিড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওদের কূলে পৌঁছবার আগেই লোকটি এসে পৌঁছল। এরপর চলল শাসানি। সত্যি বাহাদুর ছেলে বটে! দুটিতে নৌকো থেকে ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল মহানদীর বুকে। নৌকোটা তীরের দিকে ঠেলে দিয়ে ওরা উল্টোদিকের চরটা লক্ষ্য করে সাঁতার কেটে চলল। অবশেষে আমাদের প্রায় অবাক করে দিয়ে ওরা উঠে পড়ল মহানদীর বুকে জেগে ওঠা চরটার ওপর। তারপর কাশের বনের ওপারে চলে গেল, আর দেখা গেল না ওদের। এদিকে নৌকোটা নিয়ে লোকটি গজরাতে গজরাতে চলে গেল।

মহানদীতে স্নান করতে লুব্ধ হয়ে উঠলাম। ইচ্ছেটা জানাতেই সুমতি বাধা দিলে অবেলার অজুহাতে।

বললাম, আজকের মত ডাক্তারী শাস্ত্রের পাতাটা নাই বা খুললে।

বহুদিনের হারানো শৈশব আজ ফিরে এল। সেই ঘুঘু ডাকা দুপুরে শালুক সরোবরের জলকে তোলপাড় করে হাঁসেদের মত সাঁতার কেটে বেড়ান। আম জাম জারুলের ডাল থেকে ঝাপ দিয়ে জলের বুকে পড়ে তলিয়ে যাওয়া। সেই মুগ্ধ ললিত সকরুণ সুরে-ভরা শৈশব আমার তিরিশটি বছরের পরিণতিকে উপেক্ষা করে সামনে এসে দাঁড়াল। এই পরম লগ্নটিকে ফিরিয়ে দেবার কোন সামর্থ্যই আর রইল না আমার। কি পরে জলে নামা যায় এখন? সমাধান করে দিলে কুমতি। এই যে ভেজাও নতুন তোয়ালে খানা। তাই পরে জলে নামলাম। পায়ের তলায় বালুর বিছানা। টুব করে একটা ডুব দিলাম। সমস্ত জগৎ লুপ্ত হয়ে গেল।

জননী-স্নেহের অথৈ প্লাবনে তলিয়ে গেলাম যেন। কি স্নিগ্ধ, কত শান্ত, কেমন মধুর! মনে হল এই বহতা নদী-ধারার সঙ্গে

কোথায় যেন আমার নাড়ীর যোগ রয়েছে। এই পীযূষবাহিনী স্রোতস্বতী আমার মা। মনে হল—

'নদী স্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া তুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে।'

সাঁতার কাটলাম, হাত পা ঝাঁপিয়ে। ঠিক যেমনটি সহর থেকে বহু দূর গাঁয়ের কোন এক অখ্যাত সরসীতে এক তুরন্তমতি গ্রাম্যবালক সাঁতার কাটে। আঘাতে সংঘাতে মহানদীর জল মুক্তোবিন্দুর মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। জলের ভেতর থেকে যখন সারা শরীরটা শীতল হয়ে এল আর মন ভরে নেমে এল প্রশান্তি, ধীরে ধীরে উঠে এলাম। কুমতি সুমতি আক্ষেপ করতে লাগল, তোমার এ রকম মতলব আছে জানলে আমরাও কাপড় চোপড় এনে জলে নামতাম।

কাপড় বদলে আবার বসলাম সেই গাছতলায়। এখন গায়ে একটু রোদ্দুর লাগাতে বেশ আরাম লাগছে। যেন স্নানের শেষে তুরন্ত ছেলের শীতলতাটুকু রৌদ্রবসনী আঁচলখানি দিয়ে ধীরে ধীরে মুছে নিচ্ছেন জননী।

বললাম, কুমতি, আমার একটা কথা রাখবে?

কি কথা আগে শোনা যাক্।

বললাম, এ কথা কিন্তু ভেবে দেখবার নয়, নিশ্চিন্ত হয়ে কথা দিয়ে ফেলতে হবে।

বল কি বলবে?

আমায় একটি গান শোনাতে হবে ভাই।

আজ কুমতি কোন প্রতিবাদও করল না। গলা ভাঙার কোন কাল্পনিক অজুহাতও দিলে না।

বললাম, রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' থেকে গাও।

কুমতির ধীরে ধীরে ভাবান্তর হল। গাইবার আগে ওর মনটা গানের বিষয়বস্তুতে চলে যায়, তখন সারা মুখখানাতে এক অপূর্ব ভাবের আলোছায়া খেলতে থাকে। প্রথমে গুন্ গুন্ করে ও যেন সুরের রাজ্যে প্রবেশের পথ খুঁজতে লাগল। তারপর শুরু হল যাত্রা, 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।

সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে॥'

জননী জন্মভূমিকে ভালবাসার ভেতর এত কান্না কোথায় লুকিয়ে ছিল। যেন প্রাণের গোপন উৎসের রুদ্ধমুখ খুলে সেই ভাল লাগার কান্না সুরের সরণী বেয়ে উঠে আসছে। আর সেই সুরের প্রবাহিনী চলেছে ছায়াশীতল পল্লীনিকেতনের পাশ কাটিয়ে, অজানা ফুলগন্ধে আকুল বনভূমিকে বেষ্টন করে। প্রথম আঁখিপাতে যে আলোকের স্পর্শ লাভ করে আমরা ধন্য হই, যে আলোক আমাদের মুদিত নয়নের ওপর তার শেষ জ্যোতির্লেখা লিখে রেখে যায়, আজ সেই আলোক এসে পড়েছে সুরের সুরধনী ধারায়।

কুমতি গান গাইছে, সুরের নদীতে ভাবের বান ডেকেছে। আমাদের মনের কূল সেই প্লাবনে ডুবে ভেসে একাকার হয়ে গেল। মনে হল, আমার এই দেশের মাটিতে জনম মরণ সব সার্থক হয়ে যাবে।

গান শেষ হলে আমরা আবার ফিরে এলাম রূপের জগতে। ছেলে দুটো দেখি সাঁতরে আসছে চরের থেকে ঘাট লক্ষ্য করে। ওরা এক সময় ঘাটে এসে উঠল। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে মন্দিরের ওধারের পথটা ধরে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মহানদীর থেকে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কটক সহরের ওপর। কত-কালের পুরোনো এই সহর। মহানদীর দুটি ধারার মাঝে রসনার আকারে একখণ্ড ভূমি। তারই ওপর গড়ে উঠল রাজধানী, সেনা নিবাস, তাই নাম হল তার কটক।

বহিঃশত্রুর এই সহরে প্রবেশ করতে গেলেই পেরিয়ে আসতে হবে মহানদী। এমন প্রাকৃতিক সুরক্ষিত অবস্থানে গঙ্গাবংশীয় রাজা অনঙ্গ ভীমদেব যে এই নগরীর পত্তন করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবে একটি গল্প প্রচলিত আছে রাজা অনঙ্গ ভীম-দেবের নামে। মহানদীর ওপার থেকে তিনি আসছিলেন এপারের একটি মন্দিরে। নদী পার হয়ে দেখতে পেলেন এক বিস্ময়কর দৃশ্য। যুদ্ধ হচ্ছে একটি বক আর বাজের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ক্ষীণবল বকটির সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হল শিকারী বাজপক্ষী। রাজা এই অলৌকিক ঘটনার মধ্যে জীবনের কোন বৃহত্তর সাফল্যের ইঙ্গিত হয়ত পেয়ে থাকবেন। তাই মহানদীর এপারেই গড়ে তুললেন অভিনব বারাণসী কটক।

তারপর কত উত্থান পতন ভাঙাগড়া হয়ে গেছে এই কটক নগরীকে কেন্দ্র করে। মোগল, মারাঠা, শেষে ইংরাজ। কত যুদ্ধ, কত আশা নিরাশা, সন্দেহ সংশয়। তারপর আবার সব স্থির হয়ে এল। ভারতীয় গণতন্ত্র আজ তাকে সংগ্রামহীন শান্তি দান করেছে। কটকনগরীর এই যুগযাত্রার সাক্ষী হয়ে আছে মহানদী।

যদি জলের কলভাষা বোঝার ক্ষমতা থাকত তাহলে এই মহানদীর জলপ্রবাহে অনেক অজ্ঞাত ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যেত।

মহানদীর ওপারে দৃষ্টি মেলে দিলাম। দূরে ধূমলনীল পাহাড়ের শ্রেণী। শ্যামল অরণ্যে ঘেরা পাহাড়, পবিত্র মহানদীর পুণ্য প্রবাহ কটকনগরীকে মহৎ ঐশ্বর্য দান করেছে। কতক্ষণ বসেছিলাম ভাঙাঘাটের বাঁধানো বেদীতে, টুকরো কথায় কথায় বেলা শেষ হয়ে চলে গেল। সন্ধ্যায় মন্দিরের দ্বার খুলে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে পূজারী। বসে বসে দেখছি অনন্ত নভোলোক থেকে পৃথিবীতে নেমে আসছে সন্ধ্যা। 'কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর

পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধু, অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে। ধীরে ধীরে কত শত-সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ যুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার যদি বর কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে। কোন অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ।'

কবির দেখা এই সন্ধ্যা আজ আমার মনের কল্পনার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামল, এবার ওঠ দাদা, সুমতির ডাকে চমক ভাঙল।

সত্যি এতক্ষণ হোটেলে ফেরা উচিত ছিল, কারণ এবেলা যে রন্ধনপর্ব নিজেদের হাতেই নেওয়া হয়েছে। হোটেলে ফিরলাম বাজার ঘুরে। সুমতি কুমতি রান্নার কাজে লেগে গেল।

শিল নোড়ার কাজটা অবশ্য ওরা করিয়ে নিলে হোটেলের পাচক ঠাকুরকে দিয়ে।

বললাম, আমাকে কিছু অকাজের কাজ অন্ততঃ দাও। নিদেন-পক্ষে আলুর খোসাটা তুলে নিষ্কর্মার লিস্ট থেকে নিজের নামটা ছাটাই করি। সুমতি বললে, তার চেয়ে ছুরিটা নিয়ে আঙ্গুলের চামড়াগুলো তোলোগে যাও; অকারণে আলু আর আঙ্গুল দুটো নষ্ট করে লাভ কি।

অগত্যা কি করি কি করি ভাবতে ভাবতে কাজ পাওয়া গেল।

বললাম, ওসব মহিলাদের কর্ম আমাদের পোষায় না মানায়? এখন আমি বাইরে চললাম কালকের যাত্রার ব্যবস্থা করতে। ততক্ষণে তোমরা তোমাদের কার্য সমাধা কর।

বেরিয়ে গেলাম। পাশেই বাস স্ট্যাণ্ড। গাড়ীর খবরদারী

করে আর চাঁদের আলোয় চৌধুরী বাজারে চক্কর দিয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন দেখি ঘড়ি নয় ঘটিকা ঘোষণা করছে।

ঢুকেই বললাম, রান্নার কতদূর? হোটেলে পার্ত পাততে হবে নাকি?

কুমতি বললে, দেখছ না রন্ধন-পটীয়সী সুমতি দেবী 'অম্বল সম্বরা বধ' কাব্য রচনা করছেন!

এই বলে ও মাথা নেড়ে নেড়ে সুর করে আবৃত্তি করতে লাগল—

'তিন্তিড়ি পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব ব্যঞ্জন আহা রান্ধিয়া সুমতি
প্রপঞ্চ ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে!'

খেতে যখন বসলাম তখন দশটা বাজে। খিঁচুড়ি লবনহীন। সুমতি তাড়াতাড়ি নুনের কৌটোটা আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

হতাশভাবে বললাম—

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে!'

॥ মন্দির নগরীর ইতিকথা ॥

অতীত ইতিহাসের পাতায় আমি ছিলাম সুবর্ণাদ্রি, সোনার পাহাড়। আমার দেহে ছিল বালুর স্বর্ণাভা, তাই পণ্ডিতেরা হয়ত আমার এই নামকরণ করে থাকবেন। আজ আমার কান্তিতে সে কনকাভা নেই, তবে আমার পাষাণ হৃদয়ে সঞ্চিত আছে একখানি গ্রন্থ, যে গ্রন্থের পাতায় পাতায় লেখা আছে আমার সোনার স্বপ্ন কথা, কলিঙ্গের যুগ যুগ রচিত কীর্তি-কাহিনী।

পথিক, সন্ধ্যা হয়ে এল। ঐ দেখ ধৌলীপাহাড় ঘিরে দোয়া নদীতে সহস্র চন্দ্রের প্রদীপ জ্বলেছে। এই নিভৃত নীরব লগ্নে আমি মেলে দিলাম আমার স্বপ্নগ্রন্থের পাতা তোমার দৃষ্টির সামনে। সুধাংশুর শিখায় দেখ, তুমি তার পাঠোদ্ধার করতে পার কি না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলে কেন? এ যে আমারই মূর্তি। আমার সোনার অঙ্গ ঘিরে তখন ছিল শ্যামল অরণ্যের আবরণ। অরণ্যচারী মানুষ আর পশু সেদিন একই সঙ্গে বিচরণ করেছে আমার দেহের ওপর। এমনি কত ধবল জ্যোৎস্নায় এই দোয়া নদীতে এসেছে অপরূপ হরিণের দল। পান পিপাসা পূর্ণ করে তারা দৃষ্টি বিনিময় করেছে পরস্পরে। হরিণ শিশুগুলি নদীবেলায় বালুর জমিনে নৃত্য করেছে। মা হরিণী পরম স্নেহে লেহন করে নিয়েছে শিশু সন্তানের কোমল দেহ। সেদিন আমারি বুকে নেমে আসতে দেখেছি দূরের স্বর্গকে। তারপর কোন দিন শুনেছি মৃত্যুর ডাক। শুনেছি হিংস্র পশুর আক্রমণে অসহায় মৃগের আর্তনাদ। সে চিত্র দেখে শিউরে উঠেছি অজানিত আশঙ্কায়। আমি পাষাণ,

তাই নীরব সাক্ষী হয়ে আছি, নিবারণ করতে পারিনি সে নিষ্ঠুরতায়।

কখনো দেখেছি অরণ্যচারী মানুষদের সমবেত হয়ে অগ্নি-দেবী হিঙ্গুলার আরাধনা করতে। বন বিটপীর শাখা প্রশাখাকে ছেদন করে তাতে তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন সহস্র শিখা মেলে। সেই আলোকে অরণ্যভূমির অন্ধকার সভয়ে দূরে সরে গেছে। তারপর সেই অগ্নিমণ্ডলের চারদিক ঘিরে অরণ্যমানুষেরা শুরু করেছে নৃত্য মহোৎসব। বন্য কুক্কুট, বন্য ছাগ আহুতি দিয়েছে অগ্নিতে। সেই থম থম রহস্যের মাঝে বেরিয়ে পড়েছে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি গুলো আঁকা বাঁকা সাপের মত।

এবার বন্ধ হোক এই অরণ্যপর্ব। নতুন পাতায় যেখানে ইতিহাসের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, চল এখন সেখানেই যাই আমরা। ঐ তাকিয়ে দেখ, জীর্ণ চীর কমণ্ডলুধারী সাধুসন্তেরা দূর দূরান্তর থেকে আসছেন কলিঙ্গ ভূমিতে। মুখে তাঁদের দিব্য প্রসন্নতা। তোমরা আজ যে খৃষ্টাব্দ গণনা কর, তারও আরম্ভের প্রায় চারশ বছর আগে কলিঙ্গ জনপদে সেই সাধুসন্তেরা প্রচার করলেন জৈন ধর্ম। রাজার আনুকূল্য লাভ করে সে ধর্ম সেদিন প্রতিষ্ঠিত হল কলিঙ্গে। আমারই গুহাকন্দরের সংস্কার ও মার্জনা করে সাধুরা পাতলেন তাঁদের সাধনার আসন। আমি তাঁদের দিলাম আমার দেহজাত অরণ্য-পুষ্প আর সু-রসাল ফল মূল। তাঁদের উচ্চারিত আরাধনা মন্ত্রের মঙ্গল বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে।

তারপর একদিন সভয়ে শুনতে পেলাম রণদামামাধ্বনি। দূর থেকে সে ধ্বনি ক্রমেই নিকটবর্তী হতে লাগল। শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে যা দেখলাম তাতে আমার পাষাণ দেহও থর থর করে কেঁপে উঠল। চতুরঙ্গ সৈন্যসহ মগধ-সম্রাট চণ্ডাশোক এলেন কলিঙ্গ বিজয়ে।

তাঁরা শিবির ফেললেন আমারই বুকের ওপর। কলিঙ্গবাসীরাও কাপুরুষ ছিল না। সহস্র সহস্র কলিঙ্গ সেনা সেদিন এগিয়ে এল মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষায়। শুরু হল সংগ্রাম। মানুষে মানুষে সেদিন যে হিংস্রতা দেখেছি তাতে শিউরে উঠেছে আমার পাষাণ দেহ। কয়েক বছর ধরে মানুষের উষ্ণ রক্তে আমার দেহ স্নান করেছে। একদিন সে বিভীষিকার অবসান হলে দেখা গেল অশোকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। কলিঙ্গ জনপদ পরিণত হয়েছে মহা শ্মশানে। রণদুর্মদ অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর ফিরে গেলেন মগধে।

কিন্তু এই দুঃখের পঙ্কশয্যা ছেড়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠল একটি প্রাণ-পঙ্কজ। ছড়িয়ে পড়ল তার গন্ধ কলিঙ্গ ভূমি থেকে সারা ভারতভূমিতে। চণ্ডাশোকের শুদ্ধ আত্মা ফিরে এল কলিঙ্গে। অবাক হয়ে দেখলাম এ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। শুনলাম, চণ্ডাশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি দেখে ভগবান বুদ্ধের শরণ নিয়েছেন। সেদিন কলিঙ্গে তিনি প্রচার করলেন বুদ্ধ তথাগতের অমৃত বাণী—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সর্বভূতেষু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধোচ তিরিযঞ্চ অসম্বাধঃ অবেরমসপত্তং।

মা যেমন নিজ প্রাণের বিনিময়ে সন্তানকে রক্ষা করেন, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়া প্রদর্শন কর। ঊর্ধ্ব অধো এবং চতুর্দিকে সমস্ত বিশ্বের প্রতি জাগিয়ে তোল বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য অপরিমাণ দয়াভাব। ভারতাত্মার সেই অমৃতমন্ত্র সেদিন ধ্বনিত হল কলিঙ্গভূমিতে। সে বাণী ধীরে ধীরে ধর্মাশোকের সহায়তায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল ভারত ও বহির্ভারতে। আজ ভারতের এই যে অহিংস শান্তি নীতি, তার প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল

কলিঙ্গে। এই কলিঙ্গের সহস্র সহস্র মানুষ সেদিন তাদের জীবন উৎসর্গ করে সম্রাট অশোকের মনে এনেছিল পরিবর্তন, যার ফলে ভারত আজও বুদ্ধের সেই অহিংসামন্ত্রের পরম পূজারী।

ধৌলী পাহাড়ের ওপর পূর্ণচাঁদের আলো এসে পড়েছে। হস্তীর শান্তমূর্তি আঁকা রয়েছে পাহাড়ের গায়। শত সহস্র বছর কেটে গেছে, তবু সে মূর্তি মহাকালের পথের ওপর তেমনই শান্তির দূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারই পাশে পাথরে খোদিত রয়েছে অশোকের অনুশাসন, তাতে লেখা আছে, ন্যায় নীতি অনুসরণের কথা, সমস্ত অহংকার মুক্ত হয়ে মানুষকে ভালবাসবার কথা।

কি দেখছ তুমি ধৌলী পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে? এবার তাকাও উদয়গিরি খণ্ডগিরির দিকে। অশোকের পরে কলিঙ্গপতি খারভেলা আবার জৈনধর্মের প্রবর্তন করলেন। উদয়গিরির শীলাদেহে আজও খারভেলার কীর্তিকাহিনী খোদিত রয়েছে। এমনি করে জৈন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এসে পড়েছিল কলিঙ্গ জনপদে। ভাঙাগড়াই যে মহাকালের নিত্যলীলা। এবার দেখ নতুন পাতায় নতুন মানুষেরা এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাদের নব সংস্কৃতি। ওঁরা বৈদিক আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের দল। কোশলের সোমবংশীয় রাজা ও রাণীদের আনুকূল্য লাভ করেছেন ওঁরা। নৃপতিরা ঐ ব্রাহ্মণ কুলকে ভূমি দান করেছেন। তাঁদের আরাধনার জন্য নির্মাণ করে দিয়েছেন মন্দির। সেদিন সোমবংশীয়দের সামন্ত-রূপে কলিঙ্গভূমি শাসন করেছে ভঞ্জ আর শৈলোদ্ভবেরা। কলিঙ্গ-ভূমি সে সময় দেখ কত সুসভ্য হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত ওড়িয়া আর প্রাকৃতভাষায় লেখা হচ্ছে পুঁথিপত্র। মন্দিরে মন্দিরে উচ্চারিত হচ্ছে বৈদিকমন্ত্র। পত্তন হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম আর নগর। নগরীকে সুরক্ষিত করবার জন্য গড়ে উঠছে দুর্ভেদ্য দুর্গ। ঐ দেখ আর এক দৃশ্য! নিপুণ শিল্পী আর শ্রমিকদের নিয়ে নীল সিন্ধুর বুকে ভাসল সপ্তডিঙ্গা। উর্মীর আঘাতকে উপেক্ষা করে কলিঙ্গের

কলাকারেরা গিয়ে পৌঁছল পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। ভারতের ভাস্কর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মন্দিরে মন্দিরে এঁকে দিল ভারতীয় সাধনার স্বাক্ষর। আজও দেখ সে মন্দিরে বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কথা কাহিনীগুলি চিত্রায়িত হয়ে আছে।

এবার যে পাতাটি মেলে দিচ্ছি তোমার সামনে, সেখানে রয়েছে চন্দ্রকুলোদ্ভব গঙ্গাবংশীয়দের অমর কীর্তির পরিচয়। একাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝে প্রধানতঃ তাঁদেরই প্রচেষ্টায় তৈরী হল এই ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারকের বিশ্বখ্যাত মন্দিরগুলি। যেদিন আমার দেহের শিলাখণ্ডে নিপুণ শিল্পীরা গড়ে তুলল এই অপরূপ মন্দিররাজি, সেদিন আমি সার্থক হলাম। এই ভক্তভূমি ভুবনেশ্বরের শত শত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হল দেবাদিদেব মহাদেবের বিগ্রহ। কৈলাস ছেড়ে উমাপতি এলেন নব কৈলাসভূমি এই ভুবনেশ্বরধামে। লিঙ্গরাজ প্রতিষ্ঠিত হলেন ভুবনেশ্বর মন্দিরে। কিন্তু হরিহর যে একাত্মা। তাই মহেশ্বরের মন্দিরের পাশেই উঠল অনন্ত বাসুদেবের মন্দির। শিব হলেন বিষ্ণু-রুদ্রনারায়ণ। দেখ, বৃষভস্তম্ভে পক্ষ বিস্তার করে রয়েছে পক্ষীরাজ গরুড়।

দূর জনপদের কোথায় শঙ্খধ্বনি হল। আমার চেতনার তন্ত্রীতে সেই শব্দ-তরঙ্গ এসে আঘাত করল। ধৌলী পাহাড়ের তলায় বসে আমি মনে মনে যুগ যুগান্তের পথে এতক্ষণ ঘুরে ফিরছিলাম! কল্পনায় শুনছিলাম পাষাণের কথা। সঙ্গী যজ্ঞেশ্বর পাণ্ডা জানিয়ে দিলে রাতের পথে সাইকেল নিয়ে ফিরতে অসুবিধে হবে। অতএব যত শীঘ্র দ্বিচক্রযানে ওঠা যায় ততই মঙ্গল। ফিরতি পথে পাঁচ মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে যখন ভুবনেশ্বরের হোটেলে এসে পৌঁছলাম তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। যজ্ঞেশ্বর পাণ্ডা দুটি সাইকেল আর উপযুক্ত দক্ষিণা নিয়ে ফিরে গেলেন। এতক্ষণ বাইরে ছিলাম নিশ্চিন্ত ভাবনাহীন! এখন হোটেল স্যানিটোরি-য়ামের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মনে হল এত রাত বাইরে

কাটিয়ে ভাল করিনি। না জানি ভগ্নী দুটির হাতে আজ ভাগ্যের কি পরিণতি আছে। যথা নির্দিষ্ট ঘরে ঢোকবার আগে জানালা দিয়ে একবার উঁকি দিলাম। সুমতি শয্যা নিয়েছে। কুমতি অনামিকা, কনিষ্ঠা, মধ্যমা আর তর্জনীর ওপর কপোল ন্যস্ত করে বসে আছে। বিচিন্তিতা শকুন্তলা। বললাম—অয়মহং ভোঃ, এই যে আমি এসেছি। কুমতি একবার চোখ তুলেই পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হল। বুঝলাম, কোপ অতি গভীরে। এ সময় প্রবোধ বাক্য উচ্চারণ করলেই প্রবল ধারাপাতের সম্ভাবনা, অতএব পরিহাসই বিধেয়। পুনরায় বললাম, শোন, আমি দুর্বাসা। তবুও শুনিতে পাও না! কথমতিথিং মাং পরিভবসি। তারপর অভিশাপের ভঙ্গীতে হাত তুলে বললাম—

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।

কি আস্পর্ধা! অতিথিরূপে আমি উপস্থিত, আমার ন্যায় তপোনিধিকে অবজ্ঞা করিয়া অপমান করিলে?

আর ব্যাখ্যা করতে হল না। সুমতি ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল। তারপর একদিকে দুই বোন আর অন্যদিকে অপরাধী। তুমুল কলরবের মাঝে স্থির হল, আমি একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় দীর্ঘ রাত্রি বাইরে থেকে অন্যদের দুর্ভাবনায় ফেলার কোন অধিকার আমার নেই।

এই বাক্যগুলিকে যথার্থ বলে মেনে নিলাম। কুমতি বললে, তুমি গুণরাজ। গুণের আর শেষ নেই তোমার। দোষ তুমি যতই মেনে নিচ্ছ, নতুন মতলবগুলো ততই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

এরপর ভোজন পর্ব শেষ করলাম। ভুবনেশ্বরের হোটেল

স্যানিটোরিয়ামের রান্না খাদ্য সত্যিই উপাদেয়। ইচ্ছে করছিল উৎকল পাচক ঠাকুরের হাতখানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিই।

ইচ্ছেটার বহিঃপ্রকাশ হতেই সুমতি বললে, তোমার সাধ পূর্ণ হলে কিন্তু ও বেচারাকে আর হোটেলে রান্না করে খেতে হবে না। তখন ঐ সোনার হাত দুটি তোমার কাছে বাঁধা রেখেই পেট চালাতে হবে।

শোয়ার আগে ঘরে এসে ঢুকলো তামসী। বললে, পানি আনিছি।

গৌরীকুণ্ড থেকে হোটেলের পরিচারিকা তামসী জল এনেছে। ভরে নিলাম কুঁজোয়। মিনারেল ওয়াটার অব কেদারগৌরী। কুঁজোর মুখে ঢাকা দিচ্ছি দেখে কুমতি বললে, কই জল খাবে বলছিলে, খেলে না? বললাম, এ জল খেলে ক্ষিধে পেয়ে যাবে যে। তোমাদের কথায় জল খেয়ে শেষটায় রাতে ভিতে হোটেলের হেঁসেলে ধরা পড়ব নাকি।

ভোর রাতে ঘুম ভাঙল। জানালা দিয়ে ভুবনেশ্বর মন্দিরের চূড়োটি চোখে এসে পড়ল। উজ্জ্বল একটি তারা তখনো আকাশের বুকে ঠিক মন্দিরের ওপরে জ্বল জ্বল করছে। ভোরের বাতাস বইল। সোনার আলোর খবর পেয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল পুবদিকে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সুমতি কুমতি জেগে উঠল।

কে?

কথা নেই। জানালার ফাঁকে একটি মুখ উঁকিঝুঁকি মারছে। দশ বারো বছরের একটি ছেলে। রোগা, ময়লা গায়ের রঙ, মুখখানিতে কেমন এক মিষ্টিভাব মাখান। ততক্ষণে দরজা খোলা হয়েছে। বিছানায় উঠে বসে ওকে ইসারায় কাছে ডাকলাম। প্রথমে ও খোলা দরজার কাছে এসে আধখানা আত্মপ্রকাশ করল।

বললাম, লজ্জা কি, ঢুকে এস ভেতরে। এখানে তোমার দিদিরা রয়েছে।

এবার ও কি ভেবে ভেতরে ঢুকলো। দেখলাম মুখের হাসি যথাসম্ভব মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমার কাছে এসে ও যা বললে তাতে বুঝলাম, যজ্ঞেশ্বর পাণ্ডা এই নাবালকটিকে ভুবনেশ্বর ভ্রমণে আমাদের সঙ্গী করে পাঠিয়েছে। গতরাত্রে আমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পর যজ্ঞেশ্বর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাই আপাততঃ এই ব্যবস্থা।

ছেলেটির দিকে ভাল করে তাকিয়ে সুমতি বললে, কি নাম তোমার ?

গোপাল।

কুমতি সন্দেহ প্রকাশ করল, তুমি পারবে আমাদের ঠিক মত সবকিছু দেখাতে ?

এবার গোপাল ঠাকুরের মুখে খই ফুটল। এক দমে সে প্রায় সব কটি দ্রষ্টব্য স্থানের মহিমাকীর্তন করে গেল।

বললাম, গোপালজী, দুটো রিক্সা ডেকে আনো দেখি মন্দিরের কাছ থেকে, ততক্ষণে আমরা তৈরী হয়ে নিই।

গোপাল ছুটলো রিক্সা ডাকতে। আমরা যাত্রার জন্য তৈরী হলাম। আজ যাবো উদয়গিরি খণ্ডগিরির দিকে।

রিক্সা এলে কিছুক্ষণ দর দাম চললো। ওরা যতটা দাম চড়ায় আমি তার অর্ধেক নামাই। শেষে বলে, বাবু পারিবনি।

তবে যাও।

ওরা রিক্সা নিয়ে দু চার পা পেছু হটলেই আবার ডাক দিলাম।

এ যেন দিব্যি একটা খেলা চলেছে। মনে মনে জানি, ওদের ছাড়া চলবে না, মুখে কিন্তু অন্যরূপ।

শেষে ওদের তিনভাগ আর আমার একভাগ কথা রইল।

রফা হতেই চেপে বসলাম। সুমতি কুমতি উঠলো এক রিক্সায়। গোপাল ঠাকুর আমার সঙ্গে রইল। রিক্সায় বসতে গোপাল কেমন অস্বস্তি বোধ করঁছে দেখে ওর পিঠে হাত রেখে আশ্বস্ত করলাম।

রিক্সা নয়তো, যেন পক্ষীরাজ। পথের ধুলো উড়িয়ে ঝড় ঝড় শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলল। ডাইনে বাঁয়ে দু চারটে জীর্ণ ভাঙা মন্দির দেখা গেল। পায়রাগুলো মন্দিরের চাতালে ঘুরে ঘুরে পরস্পর বাক্ বিনিময় করছে। এবার আমাদের রিক্সা চলল ফাঁকা মাঠের মাঝ দিয়ে। দুধারে বিস্তৃত পাথুরে জমি। মাঝে মাঝে দু' দশটা বড় বড় গাছের জটলা। এবার ডানদিকে পড়ল উড়িষ্যার নতুন রাজধানী। কটক থেকে ভুবনেশ্বরে সরে এসেছে রাজধানী। একটি মালভূমির ওপরে গড়ে উঠছে নতুন নগরী।

রিক্সাওয়ালার কাছ থেকে জানা গেল কিছুদিন আগেও নাকি এই জায়গাটি ছিল উঁচুনীচু পাহাড়ে আকীর্ণ। পাহাড়ী জঙ্গলে হিংস্র জন্তুরও সন্ধান পাওয়া যেত। এখন দেখলাম, সেই পাহাড়কে প্রায় সমতল ভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। জঙ্গল পানার নির্বাসন হয়ে গেছে কোন্ কালে।

চওড়া পথ চলে গেছে বিভিন্ন দিকে। রাজধানীতে বাজার বসবে, তাই বিরাট বিল্ডিং তৈরী হয়ে আছে। এখন অবশ্য বাজারের বদলে দু' চারটে সরকারী অফিস বসেছে সেখানে। উড়িষ্যার বিশিষ্ট স্থাপত্য শিল্প পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে এই প্রাসাদ। ওদিকে হাসপাতালও তৈরী।

শিশু শিক্ষা নিকেতনটি কিন্তু আকারে শিশু নয়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে যেন ছোটদের মুক্ত খেলাঘর। সরকারী মিউজিয়াম আর বিভিন্ন অফিস গৃহ এদিক ওদিক ছড়ানো। কর্মচারীদের থাকবার জন্য সারি সারি ঘর তৈরী হয়ে গেছে। নম্বর দেওয়া

ঘরের গায়। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রয়োজনে বেড়ে চলবে রাজধানী। ধীরে ধীরে সব তৈরী হচ্ছে এখন।

পাশেই এরোড্রাম। রেলওয়ে স্টেশন। কলকাতা মাদ্রাজ লাইন চলে গেছে। সত্যি, ভুবনেশ্বর রাজধানী দেখলে অবাক হতে হয়। বিরাট উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে যেন একটি স্বপ্ন নগরী গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। একদিকে বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য নিয়ে জেগে আছে মন্দির নগরী। অন্যদিকে নবতম উপকরণে সুসজ্জিত রাজধানী। রাজধানীতে ঘুরে ফিরে রিক্সা চলল এবার উদয়গিরি খণ্ডগিরির পথে। এদিকের পথ নির্জন। পথের দুদিকে ছোট ছোট বন। উঁচু পাহাড়ী ঢিবির ওপরে কতকগুলো বুনোগাছে ফুল ফুটেছে। কি অপরূপ বাহার তাদের।

পথের বাঁয়ে দেখলাম বহুদূর পর্যন্ত জঙ্গল বিস্তৃত হয়ে আছে। হরেক রকম বুনোগাছের সঙ্গে বাঁশের ঝাড়ও দেখা যাচ্ছে। এ অঞ্চলটায় বিশেষ চাষ আবাদ হয় না। বনজঙ্গলের মাঝে মাঝে যে সব লোকেরা থাকে তারা বুনো বাঁশ বিক্রি করে। কেউ কেউ বা গরুর গাড়ি করে বালুপাথর বয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা চালায়। বহুদূরে মালভূমির মত একটা উঁচু জায়গা দেখিয়ে বললাম, ওদিকটার নাম কি গোপাল?

উত্তর হল, বাবু খুরদা অছি।

খুরদার নাম শুনে মনে পড়ল অনেকদিন আগেকার শোনা একটি কাহিনী। পাশাপাশি দুটি রাজ্য, খুরদা আর বাঁকী। রাজ্যের সীমানা নিয়ে গোলমাল লেগে থাকে প্রায়ই। এক সময় যুদ্ধ লাগল দুই রাজ্যে। বাঁকীর সৈন্যবল বেশী ছিল না, তাই খুরদার সৈন্যদের কাছে তাদের হার স্বীকার করতে হল। কেবল তাই নয়, এই যুদ্ধে বাঁকীর রাজা শ্রীচন্দন মহাপাত্র নিহত হলেন। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে সৈন্যেরা ফিরে এল রাজধানীতে।

সংবাদ শুনে রাণী শুকদেই পেলেন তীব্র আঘাত। তিনি ক্ষত্রিয় কন্যা, তাই খুরদা রাজার বশ্যতা স্বীকার করার চেয়ে সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন।

অমাত্যেরা তাঁকে সন্ধি করার পরামর্শ দিলে। কিন্তু স্বামীর শোকে, পরাজয়ের গ্লানিতে তখন শুকদেই প্রায় উন্মাদিনী। যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে তিনি অশ্বারোহণ করলেন। উন্মুক্ত অসি ঊর্ধ্বে তুলে ডাক দিলেন সৈন্যদের, যদি তোমরা পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে কর তাহলে এস আমার সঙ্গে।

শুকদেইর সেই বীরাঙ্গনা মূর্তি দেখে আহত সৈন্যেরা নবশক্তি লাভ করে অগ্রসর হল খুরদা অভিমুখে। তখন খুরদায় চলেছে বিজয়োৎসব। রাজধানী আনন্দমগ্ন। সৈন্যেরা প্রমত্ত হয়ে আছে পান ভোজনে। এমন সময় তাদের ওপর প্রায় অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাণী শুকদেই সসৈন্যে। খুরদার রাজা পানমত্ত সৈন্যদের কোন প্রকারে সঙ্ঘবদ্ধ করে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলেন। সারাদিন চলল উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম। শেষে রাণী শুকদেইর জয় হল। খুরদার রাজা বন্দী হয়ে এলেন বাঁকীর রাজধানীতে। এবার বিচারাসনে বসলেন মহারাণী। সৈন্যেরা শৃঙ্খলিত রাজাকে নিয়ে এল তাঁর সামনে।

খুরদার রাজা জানতেন তাঁর পরিণতি। সামান্য সৈন্যদের সামনে তিনি নিজের বন্দী অবস্থায় অপমান বোধ করলেন। বিচারাসনে আসীন রাণী শুকদেইকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, মহারাণী, আজ আমি ভাগ্যদোষে আপনার বন্দী। কিন্তু গতকালও আমি ছিলাম খুরদার প্রতাপান্বিত মহারাজ। আপনার নিকট একটি ভিক্ষা আজ আমি করব। কৃপা করে যত শীঘ্র সম্ভব আমার মৃত্যুর আদেশ দিন, আমি এই হীন অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে কৃতার্থ হই।

আশ্চর্য, রাণী শুকদেইর চোখে জল, মুখে এক অদ্ভুত হাসি।

মহারাজ, রাণী বললেন, আপনি আমার স্বামীহন্তা। আপনাকে চরম শাস্তি আমি দিতে পারি। কিন্তু আপনাকে শাস্তি দিতে গিয়ে আর একজন নিরপরাধের ওপর নির্দয় হতে পারি না। আমি জানি বৈধব্যের কি বেদনা। আপনার রাণীকে সে যন্ত্রণার অংশভাগী করতে আমি চাই না।

রাণীর আদেশে কিঙ্করেরা খুরদার রাজাকে শৃঙ্খলমুক্ত করল। অভিভূত রাজা রাণীর মহানুভবতার কাছে বার বার মাথা নত করলেন। শেষে বন্ধুত্বের নিদর্শনরূপে কুশপাল নামক স্থানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে রাজা তার ওপর খোদিত করলেন রাণী শুকদেইর কীর্তিকথা। কুশপালের সে স্তম্ভ মহাকালের আবর্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তবু লোকমুখে অমর হয়ে আছে রাণী শুকদেইর কালজয়ী কাহিনী।

একটি অরণ্যঘেরা পার্বত্যভূমির কাছে এসে আমাদের রিক্সা দাঁড়িয়ে গেল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে হেঁটে চললাম। পথটি বড় নির্জন। ডাইনে ধর্মশালা আর জৈনভবন। প্রশান্ত ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ। এবার পাশাপাশি দুটি পাহাড়। দক্ষিণে উদয়গিরি, বামে খণ্ডগিরি। উদয়গিরির অন্যনাম কুমারীপর্বত আর খণ্ডগিরির নাম খণ্ডিকা।

উঠতি পথে কলিঙ্গপতি খারভেলার অনুশাসন দেখলাম। বর্তমান উড়িষ্যা সরকার সেই অনুশাসনগুলির ইংরাজী তর্জমা করে পথের পাশে বোর্ডে লিখে রেখেছেন। সমস্ত উদয়গিরি পাহাড় যেন একটি গুহার মৌচাক। সাধুসন্তদের জন্য এই সকল গুহা তৈরী হয়েছিল খৃষ্ট জন্মের কয়েক শত বছর আগে। অবশ্য অনেক গুহা পরে তৈরী হয়েছে। যদিও এই সকল গুহায় প্রধানতঃ জৈন সন্ন্যাসীরা সাধনা করতেন, তবু কলিঙ্গ জনপদবাসীরা এই সকল পরিত্যক্ত গুহাগুলির বিভিন্ন নামকরণ করে রেখেছে। জয়া বিজয়া গুম্ফা, পনস গুম্ফা, স্বর্গপুরী, মঞ্চপুরী, হাতিগুম্ফা,

রাণীগুম্ফা আরও কত নাম। কোথাও বা গুহার বাইরে বিরাট ব্যাঘ্র-মূর্তি মুখব্যাদান করে আছে। কোথাও বা হস্তীর মূর্তি প্রস্তরে উৎকীর্ণ। হাতিগুম্ফায় নৃপতি খারভেলার অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন গুহার ভেতরের দেয়ালে নানা পৌরাণিক চিত্র খোদিত।

কোন গুহায় আবার কেবল মাত্র একজন সাধুর থাকবার জায়গা হতে পারে। এই সব গুহায় প্রবেশের সংকীর্ণ পথ আছে। হামা দিয়ে এসকিমোদের ঘরের মত এতে ঢুকতে হয়। গুহার ভেতরের মেজে মসৃণ, তবে একদিক উঁচু অন্যদিক ঢালু। সাধুদের শয়নের সুবিধের জন্যেই বোধ করি মাথার দিকটা উঁচু করে তৈরী করা হত। ভাবলে সত্যি অবাক লাগে, এই নির্জন অরণ্য বেষ্টিত পাহাড়ে তাঁরা কেমন করে এইসব গুহায় কাটাতেন। প্রবল গ্রীষ্ম কিংবা নিদারুণ শীতে এইসব গুহায় থাকা যে কত কষ্টকর তা যে কেউ দেখলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। খণ্ডগিরি থেকে একটি প্রভাতী প্রার্থনা সংগীতের সুর ভেসে আসছিল। আমরা উদয়গিরি থেকে নেমে আবার খণ্ডগিরিতে উঠতে লাগলাম। ভাঙা চোরা পাহাড়ী পথে উঠে যে জায়গায় এসে পৌঁছলাম, সেখান থেকে ওপরের দিকে একটি শুভ্র মন্দির দেখতে পেলাম। আমাদের সামনেই একটি সুচিত্রিত গুহা। ঐ গুহার পাশ দিয়ে পাহাড়ী খাড়াই পথে ওপরে উঠে গেলাম। পাহাড়ের ওপরে মন্দিরে তখনও প্রার্থনা চলছিল। জৈন মন্দির এটি। কয়েক বছর আগে কোন প্রভাবশালী জৈনভক্তের চেষ্টায় এ মন্দিরটি গড়ে উঠেছে। মন্দিরের ভেতরে দেখলাম মহিলা পুরুষে মিলে কয়েকজন ভক্ত বসে আছেন। জৈনসাধু বিচিত্র সুরে স্তোত্র পাঠ করছেন। তাঁর বলা শেষ হতে না হতেই ভক্তেরা সেই পদ আবৃত্তি করছেন। এমনি ভাবে একটানা একটা সুরের ঢেউ পাহাড়ের গুহা কন্দরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। পাহাড়ের একেবারে চুড়োয়

মন্দির। মন্দিরের পেছনে অরণ্যে অজস্র বনজ-কুসুম ঝরে পড়ছে। সুমতি একটি বড় সাদা ফুল কুড়িয়ে পেয়েছে। কি তার গন্ধ। আমরা সবাই মিলে ঐ গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। সমস্ত গাছ ভরে ফুলের উৎসব। সৌরভে রচা নিমন্ত্রণ লিপি বয়ে নিয়ে চলেছে পবন দূত। বন্য মধুপেরা সে মহোৎসবে নিমন্ত্রিত অতিথি। প্রভাতের স্বর্ণালোক, দেবতার বন্দনা, পুষ্পের সৌরভ সবকিছু এক হয়ে আমাদের এক মঙ্গললোকে উত্তীর্ণ করে দিল।

নেমে এলাম খণ্ডগিরির মন্দির থেকে। সমস্ত মন ভরে উঠেছে পরিতৃপ্তিতে। মনে হল, আজকের প্রভাত সূর্য তার স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে ঢেলে দিচ্ছেন অমৃতধারা। জলস্থল নভোস্থলী সেই আনন্দ ধারায় স্নান করে তৃপ্ত পবিত্র হয়ে গেল। কিছু পথ হেঁটে এসে রিক্সায় উঠলাম। কুমতি বললে, ক্ষিধে পেয়ে গেছে দাদা।

সকালে জলযোগ হয়নি তাই সবারই কমবেশী ক্ষিধে পেয়েছিল। পাশেই একমাত্র খাবারের দোকান দেখে রিক্সা থেকে নামলাম।

কি আছে হে তোমার দোকানে?

দোকানের মালিক হরেক রকম মিষ্টির নাম করে গেল। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষায় যা বোঝা গেল তাতে সজ্জিত মিষ্টিগুলিকে কোন মতেই সদ্যপ্রসূ বলে সার্টিফিকেট দেওয়া গেল না।

ডাক্তার ভগ্নী বার বার সাবধানতার সঙ্কেত দিতে লাগল। সুতরাং পুরাতত্ত্বে অনুরাগিনী ভগ্নীটি বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারল না। শেষে কিছু চিড়ে আর চিনি কেনা হল। তাই সই। রিক্সায় বসে তাই চিবুতে লাগলাম পরম আগ্রহে। গোপাল ঠাকুর চিড়েগুলোকে কোচড়ে বাঁধছে দেখে বললাম, ঠাকুর খেলে না যে?

গোপাল কথা না বলে মুখ নীচু করে ঐ কটি চিড়েকে বাঁধতে লাগল।

বললাম, এখন ক্ষিধে নেই বুঝি ?

গোপালের মুখখানা আরও নীচু হয়ে এল।

আর খাবার কথা তুললাম না। ছেলেটিকে দেখে বড় মায়া হয়। ওর মুখখানা ভারি মিষ্টি, কিন্তু যখন ও চুপচাপ থাকে তখন কেমন এক করুণ বিষণ্ণতা ওর মুখে চোখে ছায়া ফেলে যায়।

পথে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, কে আছে তোমার গোপাল ঠাকুর ?

মা।

বাবা, ভাই বোনেরা ?

মাথা নাড়ল গোপাল। এ সংসারে মা ছাড়া আর কেউ নেই তার।

যজ্ঞেশ্বর পাণ্ডা তোমার কেউ হয় না ?

গোপাল এর উত্তরে যা বলল তাতে বুঝলাম, গোপালের মা যজ্ঞেশ্বর পাণ্ডার বাড়ীর রান্নার কাজ করে দেয়। তার থেকে দুবেলা দুমুঠো প্রসাদ জোটে তার মায়ের। সেই প্রসাদ মা বেঁধে আনে তাদের ঘরে। তাতেই দুজনের কোন রকমে চলে যায়। যজ্ঞেশ্বরের বউ সম্বন্ধে গোপাল খুব ভাল মনোভাব পোষণ করে বলে মনে হল না। গোপালের মাকে সে যে পরিমাণ ভাত দেয় তাতে নাকি একজনেরই দুবেলা চলে না।

এদিকে গোপালঠাকুরের কাজ হল যজ্ঞেশ্বর পাণ্ডার সাকরেদী করা। অনেক সময় এ কাজ তাকে বিনে পয়সায় করতে হয়। কারণ যাত্রীদের সঙ্গে আগে ভাগেই টাকা পয়সার রফা হয়ে থাকে যজ্ঞেশ্বরের। কখনো সখনো যজ্ঞেশ্বর না থাকলে দু'চার পয়সা জোটে গোপালের ভাগ্যে। এতেই গোপাল খুশি। গোপালের কথাবার্তায় তার মায়ের ইচ্ছেটা জানা গেল। মা চায় গোপাল বড় হয়ে পাণ্ডা হবে। তখন আর তাদের এমন দুঃখের দিন থাকবে না।

গোপালের কাছ থেকে অনেক অনুসন্ধানের পর আরও একটি কথা বেরুল। গোপালের মা আজ তিনদিন জ্বরে পড়ে রান্নার কাজে যেতে পারেনি, তাই যজ্ঞেশ্বরের বউ তাদের প্রাপ্য ভাত বন্ধ করে দিয়েছে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই গোপালঠাকুরেরও চলেছে প্রায়োপবেশন।

গোপালকে আপাততঃ চিড়েগুলো খেয়ে ফেলতে পীড়াপীড়ি করলাম। কিন্তু গোপাল কিছুতেই খাবে না। শেষে বোঝা গেল, ঐ কটি চিড়ে ও তার মায়ের জন্যে নিয়ে যেতে চায়।

কথাটা শুনে তীব্র বেদনার সঙ্গে কেমন এক গৌরবে মনটা ভরে গেল। এ দেশের মাটিতেই ত সনাতনের মত সন্তানের জন্ম হয়েছিল। দুর্ভিক্ষে মা বোন পীড়িত অকর্মণ্য হয়ে পড়লে দুর্বল সনাতন তাদের খাবার জোগাড় করতে পথে বেরিয়েছিল। কিছু রান্নাভাত সে জোগাড়ও করেছিল। কিন্তু ফেরার পথে তাকে পথের ধারে গাছের তলায় শয্যা নিতে হল। সেই শয্যা হল সনাতনের শেষ শয্যা। আশ্চর্য, ক্ষুধায় ক্লান্তিতে মরল সনাতন তবু মা বোনকে বঞ্চিত করে এক মুঠো ভাত সে মুখে তুলল না।

গোপালের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, ও ক'টি চিড়ে তুমি খেয়ে নাও গোপাল, আর এই নাও এতে তোমার মায়ের পথ্য কিনে দিও। পকেট থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে গোপালের হাতে দিলাম।

গোপালের মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের একটা খুঁট তুলে নিয়ে চোখ দুটো ঢাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে। গোপালের কচি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ধারা। স্নেহের উত্তাপ লেগে ওর মনে জমে ওঠা বেদনার বরফ গলে ঝরে ছোট মুখ বুক ভাসিয়ে দিয়ে গেল। প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রথমে সে টাকাটা অবশ্য নিতে

চায়নি, কিন্তু পরে আমাদের পীড়াপীড়িতে নোটটা নিয়ে ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের এক কোনায় বেঁধে রাখল। তারপর সারা পথ গোপাল কথক-ঠাকুর। এই ভুবনেশ্বরের কোথায় কি আছে। পাণ্ডারা যাত্রীদের নিয়ে নিজেদের ভেতর কিভাবে মারা-মারি করে। যজ্ঞেশ্বর পাণ্ডা ঘুমুলে কি রকম নাকের রোল ওঠে; তাই শুনে একবার এক পয়সাওয়ালা খদ্দের সারারাত ঘুমুতে না পেরে ভোররাতে কি রকম যজ্ঞেশ্বরের নাকে দেশলাইএর কাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এইসব হরেক রকম কথায় গোপালঠাকুর পঞ্চমুখ। ফিরে এলাম হোটেলে। গোপালকে বললাম, আজ আর তুমি এসো না গোপাল, তোমার মায়ের কাছেই থেকো।

গোপাল আমার কথায় কিছুতেই রাজী হতে চায় না। যজ্ঞেশ্বর জানতে পারলে তার আর রক্ষে রাখবে না। শেষে মায়ের চাকরী-টাতে টান পড়বে। গোপালকে অভয় দিলাম। যজ্ঞেশ্বরকে এ কথাটা কোনরকমেই জানান হবে না।

আমার কথাতে তার অবিশ্বাসের কোন কারণ না থাকলেও গোপাল খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। বুঝলাম, গোপাল আমাদের সঙ্গ চায়।

বললাম, পার যদি তাহলে এস একবার পড়ন্ত বেলায়। গোপাল খুশি হয়ে চলে গেল। ছেলেটির সারা দেহে দারিদ্র্যের ছাপ, কিন্তু মনে সে দারিদ্র্য দাগ ফেলতে পারেনি।

মধ্যাহ্ন ভোজে বসেছি। হোটেলের একটি ছেলে আজ পরিবেশন করছে। বার বার ছেলেটি ঘরে এসে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, আমরা যেন খাওয়ার ব্যাপারে কোন সঙ্কোচ না করি। যদি কোন তরকারী আমাদের ভাল লেগে গিয়ে থাকে তাহলে মুখের কথা খসালেই আমাদের তা দেওয়া হবে। পোস্তটা মনে হল সুমতির খুব মুখরোচক হয়েছে। সেই পরিতৃপ্তির কথাটুকু সে বলতে না বলতেই ছেলেটি ছুটলো রান্নাঘরের দিকে। কয়েক

সেকেণ্ড পরে ফিরে এল এক হাতা পোস্ত নিয়ে। সবটুকু ফেলে দিলে সুমতির পাতে। সুমতি কিছু বলার আগেই ছেলেটি বললে, যা দরকার মনে করেন আমাকে বলবেন। চার ছ'আনা পয়সা ধরে দেবেন, ব্যস।

চমকে উঠলাম। কথাটা বলেই ছেলেটা নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে রান্নাঘরের দিকে নেমে গেল।

গোপালের মুখখানা চোখের ওপর ভেসে উঠল। তিনদিন প্রায়োপবেশনে কাটিয়েও পাঁচটা টাকা সে নিতে চায়নি ভিন্‌দেশী একটি যাত্রীর কাছ থেকে। সহানুভূতির একটুখানি ছোঁয়া পেয়ে কৃতজ্ঞতার কান্নায় শুধু ভেঙে পড়েছিল।

দুপুরের দিকে একটু জিরিয়ে নিয়ে মন্দির দেখতে বেরুলাম। গোপালকে দেরী করেই আসতে বলেছিলাম, কিন্তু আমাদের দেরী করলে চলবে না। ভুবনেশ্বর মন্দির-নগরী। মন্দিরে মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতেই বেলা শেষ হয়ে যাবে।

প্রথমেই আমরা গেলাম পরশুরামেশ্বর মন্দিরে। ভুবনেশ্বরের প্রাচীনতম মন্দির এটি। পরশুরাম মন্দিরের সমসাময়িক মন্দির-গুলির একটিও আজ অক্ষত অবস্থায় নেই। শুধু মহাকালের ধ্বংস থেকে পরশুরামেশ্বর মন্দিরটিই অবিনশ্বর মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে গড়ে উঠেছিল এ মন্দির। উড়িষ্যায় তখন চলেছিল শৈলোদ্ভবদের রাজত্ব। সেই জীবন-রস-রসিক কলিঙ্গ নরপতিরা সেদিন চেয়েছিলেন দেবতাকে প্রিয় করে মর্ত্যের মন্দিরে —মানুষের যাত্রাপথের ধারে প্রতিষ্ঠা করতে। সুদূরের কোন অদৃশ্য নক্ষত্রলোকে দেবতার বাস। সেই বাসভূমিতে কর্মব্যস্ত মানুষের সহস্রমুখী মন পৌঁছতে পারে না। তাই তাঁরা দেবতাকে দূর থেকে নিয়ে এলেন নিকটে। আপন অঙ্গনে পাতা হল দেবতার আসন। মানুষ সেদিন দেবতার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করল, তোমার ভোগ্য আমার হোক, আমার ভোগ্য তোমার হোক। আজ থেকে

আমার যাত্রা-পথের ওপরেই তোমার জন্যে রেখে যাব আমার প্রণাম। ভুবনেশ্বর এসে তার প্রাচীনতম মন্দিরটির উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে মনে হল যেন আপন গৃহের প্রবীণতম পুরুষকে প্রণতি জানালাম।

পরশুরামেশ্বর মন্দিরটির দিকে তাকালে কলিঙ্গ ভাস্কর্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি চোখে এসে পড়ে। মন্দির রচনায় সারা ভারতে যুগে যুগে বিভিন্ন রীতির অনুসরণ করে এসেছেন স্থপতিরা। কলিঙ্গের বিশেষ স্থাপত্য-রীতির নিদর্শন হল শিখর-সম্পন্ন মন্দির নির্মাণ। নগর রীতির মন্দিরে যেমন বিভিন্ন শিখর হয়েছে মূল মন্দিরের অবলম্বন, শিখর রীতিতে কিন্তু তেমনটি নয়।

মন্দির দেহে ক্ষুদ্র শিখরগুলি প্রধান শিখরের শোভা ও সম্ভ্রম বাড়িয়ে তোলে। পরশুরাম মন্দিরের সঙ্গে জগমোহন অংশটি যুক্ত হয়ে আছে। এই জগমোহনের ভেতরের ঘরটিতে কতকগুলি স্তম্ভ রয়েছে। দরজা আর পাথরের জালিকাটা জানালা দিয়ে ঐ ঘরের ভেতর অংশ স্বল্প আলোকিত হয়।

মন্দির আর জগমোহনের গায়ে অজস্র চিত্র উৎকীর্ণ রয়েছে দেখলাম। মন্দির গাত্রে কুলুঙ্গীর মত কয়েকটি স্থান। ঐ সব জায়গায় স্বতন্ত্র পাথরে তৈরী দেবদেবীর মূর্তি রাখা হত। এখন ঐ মূর্তিগুলির অধিকাংশই মনে হল কোথায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাচীন মন্দিরের ঐ সব দেবমূর্তি আলাদা পাথরে উৎকীর্ণ করে বসান হত, তাই সহজেই সেগুলিকে যেখানে খুশি নিয়ে চলে যাওয়া যেত। কিন্তু পরবর্তীকালের মন্দিরগুলিতে ঐ ধারাটি পরিত্যক্ত হয়। ভৌমরাজদের সময়ে দেয়ালের দু' তিনটি অংশে ঐ মূর্তিগুলিকে উৎকীর্ণ করে রাখা হত। যার ফলে মন্দির না ভাঙলে আর ঐ পার্শ্ব দেব-বিগ্রহগুলিকে সরান যেত না।

পরশুরামেশ্বর মন্দিরের গায়ে যে চিত্রগুলি খোদিত রয়েছে তার অনেকগুলিই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। রামায়ণ মহাভারতের কয়েকটি

চিত্র দেখতে পেলাম। শিব কাহিনীর চিত্রও উৎকীর্ণ রয়েছে দেয়ালে। 'শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান'। অবশ্য তিন কন্যের ছবি না থাকলেও ব্রতচারিণী পার্বতীর ছবি দেখা গেল। এদিকে যে ভিখারী শিবের মূর্তি। অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরেছেন বিশ্বেশ্বর। ভুবনপতি হয়েছেন ভিখারী। জগমোহনের ওপরের অংশে আর একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে। ঐ যে বহু বাহু নিয়ে রাক্ষসপতি রাবণ তুলে ধরেছেন কৈলাস ভূধর। দুটি হাত জানুতে ন্যস্ত করে ভূধরের ভার রক্ষা করছেন। ওদিকে রাক্ষস রাজের এই কীর্তিতে কৈলাসবাসীরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। গণপতি আর কার্তিকেয়র মূর্তিতে ফুটে উঠেছে যুদ্ধং দেহি ভাব।

কিন্তু পার্বতী ভীত ত্রস্তা। শঙ্করের দিকে তাঁর মাথাটি ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। আর শঙ্কিতা পার্বতীকে বাম বাহু-বেষ্টনীতে ধরে রেখেছেন শঙ্কর। দক্ষিণ করে অভয় মুদ্রা।

জগমোহন ছেড়ে মন্দিরের বিমান অংশের দিকে তাকালাম। মন্দিরটি প্রাচীন হলেও এর চমৎকার কয়েকটি কাজ যে কোন দর্শকের চোখে এসে পড়বেই। এক সারি পদ্মপর্ণ চলে গেছে। তার তলায় কতকগুলি গজ ও সিংহের মুখের অংশ খোদিত রয়েছে। আরও নীচে আহার অন্বেষণ করছে একটি অপূর্ব হংস। হংসের পুচ্ছটি আশ্চর্য ভঙ্গিমায় লীলায়িত।

এ হংস যে বাস্তবে সম্ভব নয় তা বেশ বোঝা যায়, কিন্তু সমস্ত অসম্ভবের ভেতরেও কেমন এক সামঞ্জস্য রয়েছে, যার ফলে সমগ্র চিত্রটি অভিনব সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

পরশুরামেশ্বর মন্দিরে ধ্যানে উপবিষ্ট কয়েকটি মূর্তি দেখে মনে হয়েছিল ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ। কিন্তু পরে ভুবনেশ্বরের এক অধ্যাপকের কাছে আমাদের এ ভুল ভেঙেছিল। ঐ মূর্তি লাকুলীর। প্রথম শতাব্দীতে লাকুলীর আবির্ভাব হয়েছিল ধর্ম জগতে। লিঙ্গপুরাণে লাকুলীর উল্লেখ রয়েছে। লাকুলী সম্প্রদায় তাঁদের গুরুকে মনে

করতেন শিব অবতার। ভুবনেশ্বরের বহু মন্দিরে সশিষ্য গুরু লাকুলীর চিত্র দর্শকের চোখে এসে পড়বে।

মন্দির গাত্রে নর্তক নর্তকীর মিছিল। লীলায়িত ভঙ্গীতে ওপরের অংশে একদল নৃত্যরত। নিম্নে মন্দিরা মুরলী আর ডম্বরু নিয়ে ঐকতান তুলেছে অন্যদল।

এবার এলাম আমরা বৈতাল মন্দিরে। বৈতাল, শিশিরেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর এবং আরও কতকগুলি নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের মন্দির রচনা শুরু হয়েছিল। ভৌমরাজারা এ মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দির নির্মাণের কাল সম্বন্ধে মোটামুটি বলা চলে সপ্তম থেকে অষ্টম খৃষ্টাব্দ। প্রথম পর্যায়ের মন্দিরের কাজের চেয়ে এই মন্দির-গুলির কাজে যে দক্ষ শিল্পীর হাতের ছোঁয়া লেগেছে তা যে কেউ লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। বৈতাল, শিশিরেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরগুলি যে একই ধারার সৃষ্টি তা বোঝা যায় তাদের প্রত্যেকটির সামনে খোদিত নটরাজের মূর্তিগুলির অভিন্নতা থেকে। নটরাজ নৃত্য ভঙ্গিমায় হস্তপদ সঞ্চালন করছেন, পার্শ্বে নারী মূর্তি, আর দুই চরণের মধ্যে বৃষভ। বৈতাল দেউল আর শিশিরেশ্বর পাশাপাশি মন্দির। বৈতালের গঠনে দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে দেখলাম। পরশুরামেশ্বর মন্দিরে যে হংস-চিত্র দেখেছিলাম এখানে তার সার্থক প্রয়োগ দেখলাম।

মন্দির দেহে খোদিত রয়েছে একটি রমণীমূর্তি। মনে হল সদ্য নৃত্য শেষে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। বাম কর একটি স্তম্ভে স্থাপন করে তার ওপর রেখেছেন বিবশ দেহের ভার। ঐ রমণীমূর্তির দুই দিকের দেয়ালে দুটি বিশিষ্ট উড়িষ্যা রীতির ফুল-লতা। লতাগুলির ওপর অংশে একটি বিশেষ বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করল সুমতি। মনে হল পাথরের তৈরী দুটি ফুলদানীতে পাতা আর ফুল রাখা হয়েছে। ঐ চিত্রগুলির পাশের দেয়ালে হংস-চিত্র।

একে হংসলতাও বলা চলে। হংসের পুচ্ছ থেকে অপূর্ব এক ঘূর্নিত লতা সমস্ত দেয়ালকে এক অখণ্ড সৌন্দর্য দান করেছে।

তবে এই ভৌম রাজত্বেই সম্ভবতঃ দেশে তান্ত্রিকতার প্রচলন হয়েছিল। তাই এই মন্দিরগুলিতে প্রথম তার ছাপ পড়েছে দেখা গেল। বৈতালের চামুণ্ডাই প্রধানা দেবী। কতকগুলি বীভৎস রসের চিত্রও এই সব মন্দিরের গায়ে খোদিত রয়েছে দেখলাম।

ওদিকে গৌরীকেদার মন্দির। মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখলাম, গৌরীকুণ্ডে হু'একজন স্নান করছেন। মন্দিরের এপাশে হুধকুণ্ড। হুধ কুণ্ডের জল নাকি অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ।

এরপর চললাম মুক্তেশ্বর মন্দিরের দিকে। আনুমানিক নবম শতাব্দীতে এ মন্দিরের সৃষ্টি।

মন্দিরে প্রবেশের মুখেই একটি অনিন্দসুন্দর তোরণের সামনে এসে দাঁড়ালাম। হুটি কারুকার্য খচিত স্তম্ভের ওপর একটি অর্ধ-বৃত্তাকার তোরণ। সমস্ত তোরণ-দেহে নিপুণ শিল্পীর কারুকৃতি। তোরণটির দিকে তাকালেই তার গঠনের মধ্যে এক সুপুষ্ট কমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

তোরণটির কাজ যেমন সুন্দর, মন্দির দেহও তেমনি অননুকরণীয় ভঙ্গীতে রচিত হয়েছে। প্রতিটি খোদিত চিত্রে সুষম সৌষ্ঠবের পরিচয়। এই মন্দিরে প্রথম দেখলাম গণেশের বাহন রূপে মূষিক, আর কার্তিকের বাহন রূপে ময়ূরকে। সপ্ত মাতৃকা বয়ে নিয়ে চলেছেন শিশুদের। মন্দিরের চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। তাজমহল মর্মর স্বপ্ন। তার চারদিক ঘিরে সুসজ্জিত উদ্যান। মুক্তেশ্বরের সে পরিচর্যা নেই। তবু এই মন্দিরের দিকে তাকালে মনে হবে বালু পাথরে একটি মধুর স্বপ্ন-সৌধ গড়ে উঠেছে।

এর পরবর্তীকালের মন্দিরগুলির ভেতর বিখ্যাত হল লিঙ্গরাজ আর ব্রহ্মেশ্বর মন্দির। সহর থেকে দূরে ব্রহ্মেশ্বর মন্দির, তাই রিক্সা

করেই সেখানে গেলাম। একটি সমতল ভূমির ওপর চার কোণে চারটি মন্দির রয়েছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের নিপুণ কাজের কিছু কিছু স্বাক্ষর এই মন্দিরগুলিতেও দেখা গেল। শুনলাম, রাণী কলাবতী দেবীর কামনায় এই মন্দির সৃষ্টি হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ের মন্দিরগুলির ভেতর রয়েছে রাজারাণী, অনন্ত বাসুদেব, কেদারেশ্বর, কলিঙ্গেশ্বর প্রভৃতি মন্দির।

এই সময়কার মন্দিরগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হল, উচ্চ ভিত্তিভূমির ওপর মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠা। মন্দিরের স্থায়িত্ব যে দৃঢ় সু-উচ্চ ভিত্তির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে সেই সত্যটুকু পরবর্তীকালের স্থপতিরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আমরা আজকের ভেতর রাজারাণী মন্দিরটি দেখে নেব স্থির করলাম। ভুবনেশ্বর সহর ছাড়িয়ে একটি মুক্ত প্রান্তরের মাঝে এসে আমাদের রিক্‌সা থেমে গেল, আর সামনেই দেখলাম মহাকালের পাতায় পাথরের অক্ষরে খোদিত একটি শ্লোক। এই শ্লোক রচয়িতা মহাকবিদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় আজ আর পাওয়া সম্ভব নয়, তবু তাঁদের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

রাজারাণী মন্দিরের এই নামকরণের পেছনে কি ইতিহাস রয়েছে তা অবশ্য জানা যায় না। কোন রাজা আর তাঁর রাণীর কামনা থেকে এই মন্দিরের জন্ম হয়ত হয়ে থাকবে, তবে কোন কোন পণ্ডিতের অনুসন্ধানের ফল অন্যরূপ। তাঁরা বলেন, যে বালুপাথর দিয়ে রাজারাণী মন্দিরটি তৈরী হয়েছে তা হরিদ্রাবর্ণের। আর এ অঞ্চলের লোকেরা ঐ ধরণের পাথরকে 'রজারাণী' পাথর বলেই জানে। তাই হয়ত এই বিশেষ ধরণের পাথরের নামেই মন্দিরটির নামকরণ হয়ে থাকবে।

মন্দিরের ভেতর কোন বিগ্রহ নেই। হয়তো কোনকালে দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু আজ ভুবনেশ্বরের বহু মন্দিরের মত এ

মন্দিরটিও দেবশূন্য হয়েছে। কিন্তু বিগ্রহ না থাকলেও প্রাণ রয়েছে এখানে। প্রাণের কি অভিনব প্রকাশ। প্রতিটি মূর্তি যেন সজীব কায়াময়। অষ্টদিকে অষ্টদিকপাল, নিশাপার্বতী, নটরাজ, আরও অগণিত মূর্তি। মন্দিরের গঠন পারিপাট্য যেন উৎকর্ষের চরমে এসে পৌঁছেছে। এক ইংরাজ রূপদর্শী বলেছিলেন, মানুষ প্রেমিক না হলে এমন সব মূর্তি রচনা করতে পারে না। কথাটি যে কত বড় সত্য তা উড়িষ্যার মন্দিরদেহে প্রায়-উপেক্ষিত আলেখ্যগুলি দেখলেই বোঝা যায়। যে প্রেম মানুষকে এমন অমর সৃষ্টির প্রেরণা দান করে তা যে গভীর ধ্যানসিদ্ধ প্রেম সে বিষয়ে সন্দেহ কি। শুধু মাত্র ভক্তি কিংবা রাজভীতি যুগে যুগে শিল্পীদের এইসব মন্দির রচনায় আকৃষ্ট করতে পারে না। জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ আর প্রেমের মন্ত্রই তাদের দান করেছে অক্ষয় প্রেরণা। সমগ্র ভুবনেশ্বরের দিকে তাকালে মনে হয় মহাদেব ধ্যানমগ্ন, তাই সহস্র কোটি প্রাণের বসন্তবৈভব স্তব্ধ হয়ে আছে। ধ্যান ভঙ্গ হলেই শুরু হবে প্রাণ-রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-মহোৎসব। মন্দির গাত্রে স্তব্ধ নট নটীরা যুগ যুগ ধরে সেই নৃত্যোৎসবের জন্য প্রহর গণনা করে চলেছে।

ওদিকে সুমতি আর কুমতির ভেতর কি নিয়ে একটা কলরব উঠেছে। এগিয়ে গেলাম। রাজারাণী মন্দির আর লিঙ্গরাজ মন্দিরের ভেতর কোনটি পুরোনো তাই নিয়ে বিবাদ।

আমাকে কাছে পেয়ে দুজনেই মধ্যস্থ মানল। বললাম, ওতে আমি নেই। 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করুক লয়ে তারিখ সাল'।

এবার কুমতি কৌতুকময়ী, তা হলে মশায়ের কি সন্ধান চলেছে জানতে পারি কি ?

কি উত্তর দেব এর। মহৎ সৃষ্টির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের অন্তর কি সন্ধান করে ফেরে! আজ সন্ধ্যালগ্নে ভুবনেশ্বরের কাল-চিহ্ন লাঞ্ছিত একটি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু মনে পড়ল

মহাকবির এক ছত্র কবিতা। সেই কবিতা আমার মনের উত্তর হয়ে ঝরে পড়ল,

> 'আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধুপান,
> দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
> অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে
> দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।'

সহস্র শিল্পীর অন্তরে সৃষ্টির বেদন-মন্থনে এই অমৃত মধুর আলেখ্যগুলি জেগে উঠেছিল একদিন। মহাকাল ধীরে ধীরে তাদের গ্রাস করেছে, তবু সেই জীর্ণ ভগ্নাংশের ভেতর থেকে স্থানে স্থানে জেগে ওঠা পাহাড়ী ঝর্ণার মত জ্যোতির্ময় জীবন জেগে উঠেছে অভিনব আনন্দলীলায়।

মন্দির গাত্রে একটি মূর্তির দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। অলসকন্যার মূর্তি। কি নিটোল সুঠাম দেহ সৌষ্ঠব। কান্তিময়ী একটি তরুগাত্রে দেহভার ন্যস্ত করে দাঁড়িয়ে আছে আলস ভরে। এক হাতে ধরে রেখেছে তরুশাখা। বাম পদভার তরুতলে ন্যস্ত। মুখে মৃদু হাসি। তন্দ্রার আবেশে যেন দেহ শিথিল হয়ে রয়েছে। কি তরু ওটি? দীর্ঘপত্রের মাঝে কুসুম স্তবক।

সুমতি একটি সার্থক উদ্ধৃতি করল, 'অশোক তরু উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে'।

মনে হচ্ছে যেন আমরা কালিদাসের যুগে চলে গেছি।

সত্যি এমন কান্তিময়ী কুমারী কন্যার পদ-তাড়নায় অশোকতরু অনুরাগের রঙিন কুসুম না ফুটিয়ে কি পারে! কুমতি কাকে দেখে যেন কলরব করে উঠল। পথের দিকে তাকাতেই দেখলাম গোপাল দৌড়ে আসছে।

কি খবর গোপাল, তুমি এখানে আমাদের খোঁজ পেলে কি করে?

কাছে এসে গোপাল হাঁফাতে লাগল। সে যা বললে তাতে বোঝা গেল, আমাদের বেরিয়ে আসার কিছু পরেই স্নে হোটেলে এসে কারু দেখা না পেয়ে সারা তুপুরটাই আমাদের খোঁজে মন্দিরে মন্দিরে দৌড়োদৌড়ি করে ফিরেছে। শেষে তুটি রিক্সা এদিকে এসেছে শুনে এখানে এসে হাজির হয়েছে। কুমতি বড় বেশী স্নেহপ্রবণা। গোপালের এই অবস্থা দেখে তাকে কাছে টেনে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। দেখলাম, কুমতির চোখ এরই মধ্যে ধারাস্নান শুরু করেছে।

সত্যি ছেলেটা সারাদিন বৃথা খোঁজ করে কেমন যেন নিরাশ আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বলে মনে হল। দৌড়ে আসার জন্যে খোলা বুকখানা দেখলাম দ্রুত ওঠা-নামা করছে। ওকে রিক্সায় পাশে বসিয়ে ফিরলাম হোটেলে।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে বললাম, তুমি আজ যাও গোপাল, পারতো কাল সকালে আবার এসো। গোপাল ঘরে ঢুকল না, দাঁড়িয়ে রইল দরজার আড়ালে। আবার যেতে বললাম গোপালকে। অমনি গোপাল কলাপাতার একটা মোড়ক খাটের ওপর রেখে দিয়ে দৌড়ে পালাল। খুলে দেখি কতকগুলো প্রসাদী ফুল আর নাড়ু। জানালা দিয়ে 'গোপাল গোপাল' ডাক দিলাম। কিন্তু গোপাল ততক্ষণে বড় রাস্তায় পড়ে দৌড় দিয়েছে। যে সুমতির দেবভোগেও গভীর বিরাগ, সেও দেখলাম আমাদের সঙ্গে গোপালঠাকুরের দেওয়া প্রসাদী নাড়ু খেতে লাগল।

কুমতি বলল, ছেলেটা যেমন লাজুক দেখছি, ওকে পাণ্ডা হবার উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। সুমতি বলল, সে যা বলেছিস, ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বললাম, ছি ছি প্রিয়জনের অমঙ্গল কামনা করো না। কুমতি করুণাময়ী হয়ে উঠল, ছেলেটাকে দেশে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাতে খুব ইচ্ছে করছে। সুমতি বললে,

তোমার সঙ্কল্প সাধু সন্দেহ নেই, তবে তাকে কাজে পরিণত করলেই এমন সোনার চাঁদ গোপাল আর গোপাল রইবে না জেনো।

পাশের ঘরটিতে নতুন যাত্রী এসেছে। আসা অবধি দেখছি পাশের ঘরে তালা ঝুলছিল। এখন টুকরো কথায় নবাগতদের আগমন সংবাদ পাওয়া গেল। দুটি ঘরের মাঝে একটি দরজা। এদিক ওদিক দুদিক থেকেই বন্ধ। বাইরের বারান্দার দিকেই দুটি ঘরের বেরুবার দরজা। পাশের ঘরের মানুষকে দেখা না গেলেও ভেতরের দরজার ফাঁক দিয়ে তাদের আলাপ শোনার অসুবিধে নেই। অন্ততঃ ইচ্ছে থাক আর না থাক কথা কানে এসে পৌঁছবেই।

আজ সন্ধ্যায় আর লিঙ্গরাজ মন্দিরে যাব না ঠিক করলাম। তবে এমন সাততাড়াতাড়ি বিছানায় আশ্রয় নিতেও ইচ্ছে করল না। বোনেদের নিয়ে লিঙ্গরাজ মন্দিরের পাশেই বিন্দুসরোবরের বাঁধানো বেদীতে গিয়ে বসলাম। হেমন্তের হিমানী পড়তে শুরু করেছে। সেই হৈমন্তী-গুণ্ঠন সরিয়ে চাঁদ এসে বিন্দুসরোবরের জলমুকুরে নানা ভঙ্গীতে নিজের কান্তি শোভা দেখছে। সরোবরের মাঝে মন্দির। বৈশাখে চন্দনযাত্রায় আসবে দেববিগ্রহ। নৌবিহার হবে দেবতার। বিশ্রাম করবে বিগ্রহ ঐ মন্দিরের ভেতর। সেবন করবে সলিল-স্পর্শী সজল বাতাস। আমরা কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে পারলাম না সেখানে। অবশ্য সরোবর আমাদের সেবার জন্য সজল বাতাসই পাঠাচ্ছিল, কিন্তু কালভেদে রুচিভেদ। প্রবল গ্রীষ্মে যাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই, শীতের শুরুতে তাকে বিদেয় করতে পারলেই যেন বাঁচি।

বিন্দু সরোবরের মায়া কাটিয়ে আবার হোটেলের পথে পা বাড়ালাম। পরিচ্ছন্ন পাথুরে পথ। হোটেলে ঢুকতে গিয়ে ডানদিকে এক ফালি জমিতে ফুলের বাগান। নীচের ভাড়াটেদের পুষ্প-প্রীতির পরিচয়। ওঁরা এই হোটেলে রয়েছেন বেশ

কিছুকাল। নিজেরাই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। কেবল ঘরের ভাড়াটা দিয়ে যাচ্ছেন মাসে মাসে। তামসীর কাছ থেকে এ খবরটুকু সুমতি আজ সকালেই জোগাড় করেছে।

ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, থামতে হল। পাশের ঘরের দরজা ঠেলে নতুন আগন্তুক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। আপনার বাড়ী বীরভূম জেলায়, কি বলেন ? কথা শুনেই বুঝেছি।

ভদ্রলোক এমনি আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথাটা বললেন যেন আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবার প্রয়োজনটুকুও তাঁর নেই।

ভুলটা তাঁর শুধরে দেবার জন্য সচেষ্ট হতে না হতেই ভদ্রলোক প্রায় চেঁচাতে লাগলেন, এই যে আমি তোমায় বলেছিলাম না, এঁরা তোমার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। তখন যে বড় মানতেই চাওনি। এসে দেখে যাও এখন।

একটি মহিলা এসে দাঁড়ালেন পাশের দরজায়। আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই মুখটি নামিয়ে নিলেন। মুখে মৃদু হাসি।

করজোড়ে ভদ্রলোককে তাঁর ভ্রম সংশোধন করে দিয়ে বললাম, আপনি ভুল করেছেন, বাড়ী আমাদের মেদিনীপুর জেলায়, বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা।

কথা শুনেই ভদ্রলোক প্রথমে খানিক আহত হলেন বলেই মনে হল। তারপর নিজের অপ্রতিভ ভাবটাকে আশ্চর্য ক্ষমতায় কাটিয়ে উঠলেন, দেখুন, মেদিনীপুর আর বীরভূম বলতে গেলে একই জায়গা, সবই তো আপনার পশ্চিমবঙ্গে, কি বলেন ?

খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো সুমতি। ওদিকে ভদ্রমহিলা কাপড়ে মুখ ঢেকে হাসি চাপতে চাপতে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সহাস্যে বললাম, তা যা বলেছেন, পৃথিবী আজ কত কাছে সরে এসেছে, এখন আর এই কটি গ্রাম আর জেলার দূরত্ব দিয়ে কি ওকে ঠেকিয়ে রাখা যায়।

ভদ্রলোক আমার কথায় তেমন জোর পেলেন বলে মনে হল

না। তবুও নিজের ঘরে ঢোকার আগে বলে গেলেন, একই বাংলার মানুষ, একই হোটেলের লাগাও ঘরে বাস করছি, অতএব আত্মীয়তার আর বাকী রইল কি বলুন।

মুখে হাসি টেনে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

ঘরে ঢুকেই একটা চাপা তিরস্কার কানে এল। ওপাশের ঘরে ভদ্রমহিলা স্বামীকে বলছেন, আগে ভাগেই সবকিছু স্থির করে বসবে। পঞ্চাশবার বলছি, না না না, ওঁদের কথা আমার বাপের বাড়ীর মতন নয়, তবু শুনবে না। পাঁচজনের কাছে অপ্রস্তুত হতে বড় মিষ্টি লাগে তাই না ?

এর পরের গঞ্জনা বাক্যগুলি আর কানে পৌঁছল না। সুমতি চুপি চুপি বললে, অনাত্মীয়রাই তো একদিন পরমাত্মীয় হয়ে ওঠেন। অতএব ভদ্র-লোকের অপ্রস্তুত হয়ে কাজ কি।

এবার কুমতির টিপ্পনি শুরু হল, সে যা বলেছিস, আজিকাল অনাত্মীয়কে পরমাত্মীয় করবার একটা প্রবল ইচ্ছা যে তোর মনে উঁকিঝুকি মারছে সেটা তোর বলার আগেই টের পেয়েছি।

হেসে বললাম, এ ধরণের সন্দেহজনক সখি-সংবাদ সংগোপনে রাখাই ভাল।

প্রতিআক্রমণ শুরু করল সুমতি, আত্মীয়ের ভেতর এমন উত্তাপ পাবি কোথায় রে। সেখানে তো কেবল সমালোচনা, সন্দেহ আর শাসনই সম্বল।

কুমতি হেসেই কুটিপাটি। গান ধরল,

'—তোমার গোপন কথাটি
সখি রেখোনা মনে—'

বলে ফেলো চটপট। এমন পরমাত্মীয়ের স্পর্শ কবে থেকে পেলে, যার হয়ে একদমে এতগুলো কথা বলে গেলে।

হিংসে হচ্ছে বুঝি ? সুমতির হয়ে বললাম কুমতিকে।

ও কথা বলছ কেন দাদা, আমি কি এতই হিংসুটে। আর বিশেষ যখন ব্যাপারটা আমারই ঘনিষ্টতমা সঙ্গিনীর।

ঘনিষ্ট বলেই তো কেড়ে নেবার দুর্ভাবনাটাও বেশী, বললাম সকৌতুকে। সুমতি এবার সাবধান করে দিলে। পাশের ঘরের ভদ্রলোকটিকে নিয়ে কথাটা শুরু হয়েছে, অতএব কথা দীর্ঘ হলে ওঁরা কিছু মনে করতে পারেন। কথায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাতের ভোজ্যবস্তুও এসে গেল।

রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না।

'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
মনে মনে'—

চলতে লাগলাম ভুবনেশ্বরের পাথর ছাওয়া পথের ওপর দিয়ে। ধূ ধূ পাহাড়ী প্রান্তরের মাঝ দিয়ে পথ। নীরব নিঃস্তব্ধ। কোথাও প্রান্তরের মাঝে ভগ্নপ্রায় দেউল দাঁড়িয়ে আছে। কোন পূজারী আজ আর সেখানে পদার্পণ করে না। হয়ত কোনদিন সেখানে আরত্রিকের ঘণ্টাধ্বনিও শোনা যায়নি। শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে লোকালয়ের বাইরে এই নিভৃত প্রান্তরের বুকে দেউল গড়ে রেখে গেছে।

শিল্পীর স্বপ্নের পথ ধরে যারা একদিন এসেছিল তারা আর ফিরে যেতে পারেনি। পাষাণ কারার মাঝে চির বন্দী হয়ে আছে। এই সব মন্দিরে মন্দিরে কখনো কখনো নভোচারী পাখীরা নেমে আসে। তাদের মিলন বিরহের প্রলাপে মুখরিত হয়ে ওঠে এই পাষাণ দেউল। শিল্পীর কল্পকন্যারা তখন প্রাণলাভ করে। তাদের রুদ্ধ প্রণয় কাহিনী পাখিদের আলাপে বিলাপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সবিতার হিরণ্য আলো এসে পড়ে মন্দিরের ওপর। সারাটি নির্জন দিবসে মন্দিরের মূর্তিরা ছায়া দেহে প্রান্তরের ওপর ধীর পদক্ষেপে সঞ্চরণ করে। রাতের অন্ধকার নামলে তারা আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন কোন মেঘমেদুর জ্যোৎস্নায় যখন অতীতের

স্বপ্নলোক থেকে মদির মৃদঙ্গ মুরলীর সুর বাজতে থাকে তখন দেউল অঙ্গনে ঐ কায়াময়ীরা নেমে আসে। মেঘের লীলায় চন্দ্রের আলোক কখনো বা স্তিমিত হয়। সেই আলো আঁধারী লীলায় শুরু হয় শিল্পীর মানসকন্যাদের নৃত্য। জনপদ থেকে কোন দর্শক এ নৃত্য দেখার জন্য আসে না। শুধু মহাকাশ তাকিয়ে থাকে কোটি নক্ষত্রের নয়ন মেলে; আর বিমুগ্ধা ধরিত্রীর চিত্ত সেই নৃত্যরসে উতল হয়ে ওঠে।

মনে হল আমি সেই নির্জন নৃত্যবাসরে অনধিকার প্রবেশ করেছি, তাই এই হিম জ্যোৎস্নায় মন্দির দেহে মূর্তিগুলি স্থির হয়ে নিষ্পলক নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের মুখে মৃদু হাসি, দৃষ্টিতে অনুযোগ। মনে হল আধুনিক রঙ্গরসের ভোক্তা এই মানুষটি তাদের নিভৃতলীলায় একান্ত অবাঞ্ছিত অতিথি। আর বিঘ্ন ঘটাতে চাইলাম না। ফিরে এলাম ভুবনেশ্বরের জনহীন পথের ওপর দিয়ে আমার আস্তানার একান্ত নিজস্ব শয্যার ওপর। তারপর কখন যে সেই স্বপ্নলোকের পথ ভুলে অনন্ত ঘুমের দেশে প্রবেশ করেছি তা আর মনে নেই। তারপর একসময়,

'ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম
উঠিল কলস্বর
গাছের শাখে জাগিল পাখি
কুসুমে মধুকর'—

শুভ্র প্রভাতটিকে মনে মনে নমস্কার জানিয়ে শয্যায় উঠে বসলাম।

উঠেই দেখি ভগ্নী দুটি বিছানায় নেই। রোজ আমিই আগে উঠি, তারপর ওদের জাগাই। কিন্তু আজ উল্টো। আগে ভাগে ওরাই উঠে গেছে। কতক্ষণ বসে রইলাম বিছানায়। ওরা এখুনি এসে পড়বে নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা বিছানায় ঠায় বসেও

কারু পাত্তাই মিললনা। অবাক করলে দেখছি। আমাকে ফেলে মন্দিরে পালাল নাকি। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যতদূর সম্ভব এদিক ওদিক চোখ চালালাম। তারপর আবার এসে বসলাম বিছানায়। এবার মনে মনে দ্বিতীয় রিপুর পদধ্বনি শোনা গেল, আর ঠিক এমনি সময়ে সিঁড়িতেও পদধ্বনি শুনতে পেলাম।

সুমতি ঘরে ঢুকে বলল, সত্যি দাদা, জীবনটাই একটা নাটক। সুমতি স্বভাবে না হলেও কথাবার্তায় চিরদিনই একটু দার্শনিক।

কৌতুক করে বললাম, এমন প্রভাত বেলায় আবার বৈরাগ্যের রঙ লাগল কি করে?

ঠাট্টা নয় দাদা, সুমতির গলাটা কেমন ভারী হয়ে উঠল, মস্ত একটা অঘটন ঘটে গেছে।

হঠাৎ এমন বিদেশ বিভূঁয়ে কি অঘটন ঘটল তাই যখন শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে উঠেছি, ঘরে এসে ঢুকল দ্বিতীয়া, কোলে বছর দুয়েকের একটি ছেলে। কুমতি আঁচল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছছে আর এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে ছেলেটিকে।

এমন এক অভাবনীয় পরিবেশের মাঝখানে পড়ে বোকা বনে যাওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি। কতক্ষণ পরে একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসলাম, কি হল তোমার কুমতি, কাঁদছই বা কেন? কোলে ও কার ছেলে?

সুমতি বললে, ও ভোলানাথ।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু এমন কান্নার ঘটা কেন?

আবেগে উচ্ছ্বসিত হলে কুমতির কথা বন্ধ হয়ে আসে। অতএব উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হল। কুমতি একসময় শান্ত হয়ে যে কথাগুলি বলে গেল তা শুনে মনে হল যেন একটি বিয়োগান্ত উপন্যাস পাঠ করলাম।

কুমতির বলা শেষ হলে বললাম, ওঁরা এখন দেশে গেলেই ত পারেন।

শকুন্তলাদিকে সে কথাই বলেছিলাম আমি, কিন্তু তিনি বললেন, কি হবে ভাই দেশে গিয়ে। যিনি আমার জন্যে মায়ের সঙ্গে বিবাদ করে নিজের সব অধিকার ছেড়ে চলে এলেন, সে জায়গায় তাঁর মৃত্যুর পরে আমি কোন প্রাণে ফিরে যাই বল।

বললাম, এখন ত শাশুড়ী নাতি আর বৌকে কাছ ছাড়াই করতে চাইছেন না, তাহলে আর অতীতের ব্যথাকে মনে পুষে রেখে লাভ কি ?

সে তুমি বুঝবে না দাদা, সুমতি বললে, আজ আর শাশুড়ীর ওপর হয়ত ওঁর কোন আক্ষেপ নেই, কিন্তু ভিন্ন জাতি বলে শাশুড়ী একদিন যাকে ছেলের সঙ্গে পথে বের করে দিলেন, তার মনে একটা অভিমান থাকবে, এটা স্বাভাবিক নয় কি ?

কুমতি বললে, আর তা ছাড়া এত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়েও ভদ্রলোক প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই মরলেন। এ অবস্থায় সেই ধনসম্পত্তির অধিকার ফিরে পেতে কি প্রাণ চায় দাদা।

বললাম, কিন্তু তোমার শকুন্তলাদির ছেলের কি হবে। তাকে তো আর পথে পথে এমন করে ফেলা যাবে না।

কুমতি বলল, চিরদিন কি মানুষের মন সমান থাকে। সদ্য জীবনের এমন একটা দুর্ঘটনার পর মানুষ একটু বেশী রকমই সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ে। হয়ত একদিন ছেলের হাত ধরে শকুন্তলা-দিকে নতুন করে স্বামীর দেশে ফিরতে হবে। চোখের জল এখন যেমন পড়ছে তখনও তেমনি পড়বে। তবু ছেলের মুখ চেয়ে সে দুঃখও তাঁকে ভুলতে হবে।

ছেলেটির দিকে তাকালাম। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সবল চঞ্চল। কুমতির কোলের উত্তাপ তাকে শান্ত করে রেখেছিল এতক্ষণ। একটু ছাড়া পেয়েই প্রথম কোন্ জিনিষটিকে আক্রমণ করবে তাই বিবেচনা করতে লাগল। মুহূর্তমাত্র, তারপর দৌড়ে গেল ঘরের কোণে টেবিলটি লক্ষ্য করে। টেবিলের ওপর একছড়া কলা। কলার

কাছে গিয়ে ও থমকে দাঁড়াল। একবার আমাদের দিকে ফিরে তাকাল, তারপর আবার চাইল কলাগুলোর দিকে ; কিন্তু নিজের হাতে তুলে নিল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। ও কি! ঠোঁট কাঁপতে শুরু করেছে। কুমতি অমনি দৌড়ে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিল। চোখে আঙুল দিয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে ততক্ষণে ক্ষুদ্র অতিথিটি। পরের দ্রব্যে হাত দেওয়া বারণ, তা বলে তোমরাই বা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখছ কি? একটা কলার জন্যে কতক্ষণ প্রতীক্ষা করে থাকা যায়। অতএব অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের একমাত্র উপায় রোদনরূপ বলের প্রকাশ।

কুমতি ওর কান্না থামাতে ব্যস্ত। সুমতি সেই ফাঁকে ওর হাতে একটি কলা ছাড়িয়ে গুঁজে দিলে। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ভোলানাথ মাঝে মাঝে কলায় কামড় দিতে লাগল। কান্নার চেয়ে কলার মিষ্টত্ব যতই উপলব্ধি হতে লাগল, ততই কান্নার প্রতি আগ্রহ কমে সেটা পুরোপুরি গিয়ে পড়ল কদলীর ওপর। সুমতি কিছু বিস্কুটও জোগান দিল। এবার ভোলানাথ কুমতির কোলের চেয়ে সুমতির সান্নিধ্যটাই লাভজনক বলে ভেবে নিয়ে তার দিকে দুটি বাহু বাড়িয়ে দিলে।

কুমতি গায়ে টোকা দিয়ে বললে, তবে রে দুষ্টু শিরোমণি, এতক্ষণ আমার কোলে কাটিয়ে এখন পর করে দেয়া?

এবার ভোলানাথের দৃষ্টি জানালার বাইরে কোন একটি বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হল। অমনি হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল সে। ভোলানাথের নির্বাচিত বিষয়টি দেখবার জন্য দৃষ্টি ফেরাতেই দেখি এক ভদ্রমহিলা জানালার আড়ালে থেকে ভোলানাথকে হাত নেড়ে ডাকছেন।

সুমতি অমনি স্বাগত জানালে, আসুন শকুন্তলাদি।

প্রথমে উনি কি ভেবে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। কুমতি বাইরে গিয়ে ওঁকে ডেকে নিয়ে এল।

ইনি আমার দাদা।

শকুন্তলাদি হাত তুলে নমস্কার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি নমস্কার জানালাম। পরণে সাদা থান। সোনার মত উজ্জ্বল রঙ। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হল, সাধারণের থেকে ইনি স্বতন্ত্র। সমস্ত অবয়বে কেমন একটি শান্ত সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠেছে।

বললাম, আপনার ভরতের কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞানটা একটু বেশী। হাতে করে তুলে না দিলে নিজে থেকে কোন কিছুই নেবে না।

মৃদু হাসলেন শকুন্তলাদি। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। সন্তানের প্রশংসায় মায়ের পরিতৃপ্তি।

বসতে বললাম। শকুন্তলাদি হেসে বললেন, নীচে মা একা রয়েছেন, অন্ধ মানুষ, বেশীক্ষণ ওঁকে একা ছেড়ে আসতে সাহস হয় না।

তবু বসলেন উনি।

বললাম, যখন সুযোগ পাবেন ওপরে চলে আসবেন। একা থাকার চেয়ে ওরা যে কদিন আছে, আলাপ-আলোচনায় কাটাবেন।

শকুন্তলাদি হেসে বললেন, ঘনিষ্ঠতায় দুঃখ পেতে হয়। ওঁর মারা যাবার পর থেকে বন্ধুবান্ধব ছেড়ে শাশুড়ী আর ছেলেকে নিয়ে প্রায় একা একাই কাটাচ্ছিলাম। আজ হঠাৎ এদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কুমতি বলল, একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের পর।

ম্লান হেসে শকুন্তলাদি বললেন, তোমাদের সঙ্গে দেখা না হলেই বুঝি ভাল ছিল। তোমাদের দেখে কলেজের দিনগুলোর কথা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে।

কথাগুলোর ভেতর বেদনার সুর ক্রমেই ঘনিয়ে উঠছে দেখে ওদের কথান্তরে নিয়ে যাবার জন্যে বললাম, আপনি কিন্তু শুধু ওদের দিদি হলে চলবে না, আমারও শকুন্তলাদি আপনি।

হেসে বললেন, আমি কিন্তু শকুন্তলা নই, তাপসী।

কিন্তু ওরা যে—

ওদের শকুন্তলাদি আমি, তবে আমার আত্মীয়-পরিজন সবার কাছেই আমি তাপসী।

কুমতি কলরব করে উঠল, আমরা এক কলেজেই পড়তাম কিনা, সেই থেকে ওঁর সঙ্গে পরিচয়। আমরা সবে কলেজে ঢুকলাম আর ওঁর তখন ফোর্থ ইয়ার অর্থাৎ যাবার আয়োজন। কলেজে নতুন আর পুরোণো ছাত্রীদের সম্মেলনে ঠিক হল, শকুন্তলা নাটকের অভিনয় হবে। তাপসী বোস হবে শকুন্তলা। কথাটা ছড়িয়ে পড়ল ছাত্রীমহলে। সেই কলাবতী কন্যাটিকে তখনও চোখে দেখি নি, শুধু তার বাঁশী শুনেছি। আমরা নতুন মেয়েরা তাকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলাম। মনে মনে তখন অনেকের ঈর্ষার আগুনও জ্বলেছে।

কুমতির কথার মাঝেই তাকে থামিয়ে দিলেন শকুন্তলাদি, কিন্তু জানেন দাদা, আমি অনসূয়াকে প্রথমেই চিনে নিয়েছিলাম।

কুমতি হেসে বললে, আমার নাম কিন্তু অনসূয়া নয়।

বাধা দিলেন শকুন্তলাদি, সেদিনও তুমি সবার ঈর্ষার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনসূয়াই ছিলে, আজও তেমনি অনসূয়াই রয়েছ, যেমন তাপসী শকুন্তলা রয়ে গেছে তোমাদের কাছে।

সুমতি বলল, দিদি, বিশাখার খবর কি? সে এখন কোথায়?

আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে কুমতি বলল, বিশাখা হল শকুন্তলাদির বোন। আমাদের শকুন্তলা নাটকের প্রিয়ম্বদা।

শকুন্তলাদি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অতি ধীরে উত্তর করলেন, উনি আমাকে গ্রহণ করে গৃহহারা হলেন, আর আমাকেও বাপের বাড়ীর মায়া কাটিয়ে চিরতরে বিদায় নিতে হল। তারপর আর ওরা কোন খবর রাখেন নি আমাদের। একবার শুধু শুনেছিলাম, বিশাখার বিয়ে হয়েছে। মা বাবা ইঞ্জিনিয়র

জামাইকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। কিছুক্ষণ থেমে ম্লান হাসি হেসে বললেন, হয়তো তাপসীর দেয়া আঘাত এতদিনে ভুলেছেন তাঁরা।

আমাদের বিছানার একপ্রান্তে বসে সন্ত স্বামী বিয়োগ বিধুরা মেয়েটি তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন নিজের মনের গভীরে। একদিন একটি মানুষকে জীবনের সঙ্গী বলে গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে পিতৃগৃহ আর শ্বশুরালয় দুটিই তাঁকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু যার আশ্রয়ে থেকে একদিন সব দুঃখই তিনি জয় করতে পেরেছিলেন, আজ বিধাতা তাঁর সেই সম্বলটুকু কেড়ে নিয়ে তাঁকে জীবন ব্যাপী অনন্ত দুঃখের মাঝখানে ফেলে দিলেন। এখন বিধবা শাশুড়ী তাঁকে গ্রহণ করবার জন্য এসেছেন। পিতৃগৃহে ফিরে গেলেও হয়ত তাঁর স্থানাভাব হবে না। কিন্তু আজকের সব আহ্বানের মাঝে কেমন এক পরাজয়ের গ্লানি মিশে আছে। আজকের এই করুণার মাঝে তাপসীর তৃপ্তি কোথায়।

শাশুড়ীর ডাক এল। ছেলেটিকে কোলে করে শকুন্তলাদি নেমে গেলেন নীচে। যাবার সময় দুটি বোনকে ডেকে গেলেন ওঁর ঘরে যাবার জন্যে।

এর পরের কটি দিন আর বোনেদের পাত্তাই পাওয়া গেল না। ভক্তভূমি ভুবনেশ্বরের পথে পথে শকুন্তলাদি আর তাঁর শাশুড়ীর সঙ্গে বোনেরা ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেবল ভোজন আর নিদ্রার সময়টিতে যা সাক্ষাৎটা ভাগ্যক্রমে মিলে যায়। মাঝে মাঝে আমার একটু লাভ হতে লাগল। নিরামিষ তরকারী আর পূজোর ফলমূল সন্দেশ শকুন্তলাদি আমার জন্যে ওপরে পাঠাতে লাগলেন। আমি যে একটি ভোজনবিলাসী এই সংবাদটি হয়তো ভগ্নীরা সংগোপনে শকুন্তলাদির কর্ণগোচর করে থাকবেন।

ইতিমধ্যে গোপালের মা একদিন এল প্রসাদ নিয়ে। মাথায় ঘোমটা টেনে সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে রইল প্রসাদী থালা হাতে করে

গোপাল তার মায়ের পরিচয় দিয়ে আগে ভাগে সুমতির সন্দেহ-ভঞ্জন করে যা বলল তার অর্থ, এ প্রসাদ বাইরের বিক্রি প্রসাদ নয়। কোন মক্ষিকা এই প্রসাদে বসবার সুযোগই পায়নি। অতএব দিদিমণিরা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করলে গোপাল আর গোপালের মা কৃতার্থ হয়। গোপালের মায়ের আন্তরিকতায় দেবভোগ সত্যিই সেদিন বেশ উপাদেয় বলেই মনে হল। ঐ প্রসাদের কিছু অংশ পাঠিয়ে দিলাম নীচে। শকুন্তলাদি কিছু পরে ওপরে এসে প্রসাদের প্রশংসা করে গেলেন। গোপালের মা আমাদের খাইয়ে তবে উঠল। যতক্ষণ আমরা খাচ্ছিলাম, গোপালের মা দরজার আড়ালে বসে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। সুমতি তার কাছে গোপালের সরল ব্যবহারের খুব প্রশংসা করল। যাবার সময় কুমতি গোপালের মাকে কয়েকটা টাকা দিতে গেল। অনেক অনুরোধেও গোপালের মাকে সেই টাকাগুলি নিতে রাজী করাতে পারা গেল না। বার বার করে গোপালের মা তার জ্বরের সময় আমার দেয়া টাকাগুলোর কথা তুলে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল।

ভাবলাম, দারিদ্র্যের মাঝখানেই হৃদয়ের সত্যকার ঔদার্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অপরিমেয় বিত্তের মাঝে হৃদয়ের সে সৌন্দর্য আপনার বিকাশের সহজ পথটি খুঁজে পায় না। ভাল লাগছে ভুবনেশ্বর। ভাল লাগছে তার পাথর ছাওয়া পরিচ্ছন্ন পথ, মন্দির, মানুষ। ভুবনেশ্বরের আকাশে বাতাসে এক প্রশান্ত পবিত্রতা আছে। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি ভক্তের পদধূলিতে ধন্য হয়ে উঠেছে এই ভক্তভূমি ভুবনেশ্বর ধাম।

শকুন্তলাদির ফুলের সখ আছে, তাই তাঁর ঘরের সামনে বাগান তৈরী করেছেন নিজের হাতে। হেমন্তের শুরুতে কয়েক রকম মরসুমী ফুল ফুটে পথের ধারে একটি মনোরম কবিতা রচনা করে রেখেছে। একদিন ফেরার পথে দেখলাম শকুন্তলাদি উঠোনে বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পিঠে একরাশ চুল স্রোতের মত নেমে গেছে।

পথের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। আমি যে প্রায় পাশ দিয়েই এলাম, একেবারে লক্ষ্যই করলেন না। আমি কিন্তু দেখলাম তাঁর চোখে জল। নিজের ভেতর ডুবে গিয়ে কিছু ভাবছেন। উপেন ঘোষ দস্তিদার মশায়ের আঁকা একটি ছবি কৈশোরে আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। ছবিটি এক রূপবতী কন্যার, সদ্য বৈধব্যের আঘাতে শীতের শিশিরে কমলের মত করুণ হয়ে উঠেছেন। হাতে ধরে রেখেছেন পদ্মপর্ণ। সেই পত্রে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুবিন্দু।

ছবির তলায় নাম রয়েছে, 'পদ্ম পত্রে অশ্রুনীর'। এই চিত্রের সম্পূর্ণ অর্থটি সেদিন না বুঝলেও কি এক অব্যক্ত ব্যথায় আমার কিশোর মন ভরে উঠেছিল। সে চিত্র এখনও আমার সংগ্রহের ভেতর রয়েছে। আজ মুখোমুখি সেই চিত্রটি দেখলাম। ছবি কায়া হয়ে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

সেদিন বিন্দু সরোবরের ধার দিয়ে আসছিলাম, পেছন থেকে ডাক এল, ও মশায় শুনছেন, ও মশায়।

ডাকটি বাংলা ভাষায় শুনে এবং নিজেকে মশায় শ্রেণীভুক্ত মনে করে পেছন ফিরে তাকালাম। হাঁ, আহ্বানকর্তা আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন। মুখোমুখি হতেই চিনলাম, আমাদের পাশের ঘরের সেই পরমাত্মীয় মশাই।

সাত সকালে ফিরছেন কোথায়? একগাল হেসে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

হেসে বললাম, কই ভর সন্ধ্যে চলছে এখন।

তার মানেই তাই। আসুন না এই দীঘির ধারে একটু বসে যাই।

অগত্যা কি আর করা যায়, ভদ্রতার খাতিরে বিন্দু সরোবরের ধারে বসতে হল। কিছুক্ষণ আবহাওয়া ইত্যাদির খবরাখবর নিয়ে ভদ্রলোক বেঢপকা জিজ্ঞেস করে বসলেন, আপনি মেয়েদের বিশ্বাস করেন?

বললাম, করি, কিন্তু এ প্রশ্ন কেন বলুন তো ?

ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা অন্য কথা বল্লেছেন।

সেটা আমি স্ত্রী জাতির প্রতি সুবিচার বলে মনে করি না। অবশ্য আপনারা আবার আমাকে ওদের পক্ষের উকীল ভাববেন না যেন।

ভদ্রলোক খুব একদম হেসে নিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন। এ প্রশ্নটিও বিশ্বাস অবিশ্বাস ঘটিত।

আপনি দৈবে বিশ্বাস করেন নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক এমন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটা বললেন, যাতে করে ওঁকে সমর্থন না করলে দীর্ঘ তর্কের অবতারণা করতে হয়। তাই আলোচনা দ্রুত সমাপ্ত করবার জন্যে বললাম, তা করি বই কি।

কিন্তু নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক কথার পিঠে কথা চড়াতে লাগলেন, মশায় প্রাণের কথাটি বলেছেন। আজকালকার বিজ্ঞান সভ্যতার যুগে কেউ আর দৈবে বিশ্বাসই করতে চায় না। অন্যে পরে কা কথা, এই দেখুন না, আমার স্ত্রীই মানতে চান না।

এবার বললাম, মানা আর না মানার ব্যাপারে যার যেমন অভিরুচি। সেখানে জোর করলে চলবে কেন ?

ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু ব্যাপারটা আমার একার হলে ত চুকেবুকে যেত মশাই। এতে যে দুজনেরই অংশ রয়েছে।

হেসে বললাম, সে কি রকম ?

ভদ্রলোক প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হলেন। তারপর আমার আরও কাছে সরে এসে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, আপনি দৈবে বিশ্বাসী কিনা, তাই কথাটা আপনাকে বলছি। নইলে এসব কথা কাউকে বলার না।

ভদ্রতার এমনি বিপদ যে ভদ্রলোকের ভনিতাটুকুও হজম করতে হল।

ভদ্রলোক বললেন, আমাদের বিয়ে হয়েছে পুরো তেরোটি বছর, কিন্তু আমি আজও নিঃসন্তান।

ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। অত্যন্ত বিমর্ষ বলে মনে হল। বললাম, সন্তান ভাগ্য সবার সমান নয়।

বললেন ভদ্রলোক, মশায়, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আমি রাজা বাদশা না হলেও নিঃসম্বল নই। পিতৃদত্ত জমিজমাও বেশ কিছু রয়েছে। বর্ধমানের গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপর বাড়ীখানাও আমার নিজস্ব। কিন্তু মশায় সে গৃহ গৃহই নয় যার মধ্যে গৃহিণী নেই, আর সে গৃহিণী গৃহিণীই নয় যার কোলে সন্তান নেই।

বললাম, কিন্তু ছেলেপুলে না হলে কি আর করা যায় বলুন ? হেসে বললাম, আর তা ছাড়া এ কথাগুলো আপনার গৃহিণীকে আবার শোনাবেন না যেন। তাহলে তাঁর ক্রোধ এবং ক্রন্দন, দুটির কোনটিকেই রোধ করতে পারবেন না।

বিপদে যে একেবারে পড়িনি তা বলি কি করে। প্রথম প্রথম এ সব কথা সাংসারিক কলহের ভেতরে স্ত্রীকে শোনাতাম। তার ফল আপনি যা অনুমান করেছেন ঠিক তাই হত।

তারপর অনেক ওষুধ বিষুদ খাইয়েছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষে আমাদের কুলগুরু এই ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাঠাকুর আমাকে চিঠি লেখায় সস্ত্রীক এখানে এসে পৌঁছেছি। তিনি আমাকে আশ্বাসও দিয়েছেন।

অবাক হয়ে বললাম, সে কি রকম ?

সে বড় গোপনীয় ব্যাপার মশাই। এমনকি আমার স্ত্রীও কথাটি জানেন না। তবে মনের কথা কাউকে না বললে শান্তি পাই কি করে। তাই তো আপনাকে ডেকে আনলাম।

বললাম, যে কথা আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করে বলতে পারেননি, আমাকেই বা সে কথা বলবেন কি করে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমি মানুষ চিনি মশায়। ঐ যে

আগেই আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি, আপনি দৈবে বিশ্বাসী। কিন্তু আমার স্ত্রী ওসব একেবারেই মানতে চান না। তাই সমস্ত ব্যাপারটা গোপনেই ঘটিয়েছি।

বললাম, সে কি, আবার বিয়ে থার ব্যবস্থা করেছেন নাকি? তাহলে কিন্তু আইনের আওতায় গিয়ে পড়তে হবে।

ভদ্রলোক কানে আঙুল দিয়ে বললেন, কি যে বলেন মশাই, ভদ্রসন্তান দু'বার বিয়ে করে? বলতে নেই, স্ত্রীর ওপর আমার আকর্ষণ আর পাঁচজনের চেয়ে কিছু বেশী বই কম নয়।

হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, গোলমালটা আমাদের কেবল দৈব-বিশ্বাস নিয়ে, অন্য কিছুতেই নয়।

আলাপকে সংক্ষিপ্ত করবার জন্য বললাম, এখন বলুন ঘটনাটা কি ঘটেছে।

হাঁ হাঁ, তাই বলছি শুনুন। আমার কুলগুরু পাণ্ডা মহারাজ আমাকে সম্প্রতি দেশে একখানি চিঠি লিখে জানালেন তিনি একটি বালকের সন্ধান পেয়েছেন, যিনি গত দুই জন্ম পূর্বে আমার পিতা ছিলেন। তাঁর প্রতি আমি অশেষ দুর্ব্যবহার করে তাঁর অভিশাপ কুড়িয়েছিলাম। সেই থেকে আমি পুত্রলাভে বঞ্চিত। গত জন্মেও নাকি আমি ছিলাম অপুত্রক। এ জন্মে ত কথাই নেই, চোখেই দেখছি মশাই।

বললাম, তারপর কি হল।

পাণ্ডামহারাজের চিঠি পেয়েই স্ত্রীকে নিয়ে একেবারে ভুবনেশ্বর-ধামে চলে এলাম। অবশ্য স্ত্রীকে কিছুই জানাইনি। কুলগুরুর বারণ।

মনে মনে হাসি চাপতে চাপতে বললাম, আপনার সেই পূর্বজন্মের পিতৃদেবের দেখা পেয়েছেন?

দেখা কি মশাই, একেবারে তাঁর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ লাভ করে ধন্য হয়েছি। তিনি আমার ওপর সদয় হয়ে আশীর্বাদ করেছেন।

তাঁর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ এনে গোপনে আমার স্ত্রীর খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়েও দিয়েছি।

হেসে বললাম, তাহলে আপনার দুঃখ ঘুচল বলুন।

ভদ্রলোক বললেন, আর একটি করণীয় আছে। সেটি হল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। আমার বালক পিতৃদেবই আমায় এ কথাটি বলেছেন। আজ সব ব্যবস্থা করে এসেছি। এতে মশায় প্রচুর টাকার দরকার। বাড়ীতে চিঠি পাঠিয়েছি, চার ছ' দিনের মধ্যেই টাকা এসে যাবে।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন, আর দেখুন আপনাদের মা বাবার আশীর্বাদে আমার পয়সার তেমন অনটনও নেই, তাছাড়া যার জন্যে টাকার দরকার আমি তো তারই কারণে এই টাকা খরচ করছি। আপনি কি বলেন?

ভদ্রলোক আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

কি আর বলি। টাকা থাকলে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। মুখে বললাম, বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। অতএব আপনি যা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে করছেন তাই করুন।

আমার কথায় ভদ্রলোক খুব খুশি হয়ে গেলেন বলে মনে হল। আপনি এখন আছেন তো মশায়, এই আমার যজ্ঞের সময় পর্যন্ত।

বললাম, কালই যাচ্ছি পুরী। ভদ্রলোক নিরাশ হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হোক, আপনি অভীষ্ট লাভ করুন, এই কামনা জানাচ্ছি।

ভদ্রলোক সঙ্গে যেতে যেতে গদ গদ হয়ে আমার প্রশস্তি করে চললেন। এ বিজ্ঞান যুগে আমার মত এমন পুণ্যাত্মা দৈব বিশ্বাসী মানুষ নাকি ভূ-ভারতে বিরল। এজন্যে আমার ভবিষ্যৎও নাকি অত্যন্ত উজ্জ্বল। কিন্তু মনে মনে ভদ্রলোকের ভবিষ্যতের চিত্রটি দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। হোটেলে এসে কথাটা ভগ্নী দুটিকে

বললাম। সুমতি বললে, উড়ে পাণ্ডা বাঙালীকে ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে দিলে ?

বললাম, ও রকম প্রাদেশিকতা টানছ কেন ? দৈবের নামে অধিকাংশ মানুষই যে দুর্বল।

কুমতি বললে, আমি ভাবছি গোপালের কথা। পাণ্ডা হয়ে শেষে আমাদের গোপাল যেন না এমন ধুরন্ধরটি হয়ে ওঠে।

রাতে নীচে খাবার নেমন্তন্ন। শকুন্তলাদির শাশুড়ীর ইচ্ছায় এ ভোজের আয়োজন। রাত ন'টায় শকুন্তলাদি এসে বলে গেলেন, আপনাদের হোটেলে মিল বন্ধ করলাম, এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে আমার রান্নার। সুমতি কুমতি সাহায্যে না থাকলে বোধহয় আজ রাতের রান্না আগামী কাল খেতে হত।

হেসে বললাম, আয়োজন মনোমত হলে রাতের বিলম্বে আটকাবে না।

শকুন্তলাদি বললেন, তরকারীর পদ না পরিমাণ ? কোনটি আপনার বেশী পছন্দ ?

বললাম, দুটিই।

শকুন্তলাদি নামতে নামতে বললেন, আপনি সত্যিই ভোজন-বিলাসী। তবে আপনার তরকারীর পদোন্নতি করতে গেলেই অকারণে রাত বেড়ে যাবে। তার চেয়ে যা হয়েছে তাই পরিবেশন করব অতিথিকে।

আধঘণ্টা পরে একেবারে আসনে বসবার ডাক এল। শকুন্তলাদি নিজেই এলেন। বললাম, ইতিমধ্যে একবার এসে প্রবোধের ডাক দিয়ে গেছেন। এখন তাহলে সত্যি সত্যি আসল ডাক দিতে এলেন তো ?

উঠুন দাদা, রাত করলাম, এদিকে অতিথিকেও তুষ্ট করতে পারব না। আমার দেখছি দুদিকেই পরাজয়।

ঘরে ঢুকে দেখি সুমতি কুমতি আগেই আসনে চেপে বসে আছে।

শকুন্তলাদির শাশুড়ীর সঙ্গে আগে আলাপ করিনি। এই প্রথম তাঁর মুখোমুখি হলাম।

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতেই বৃদ্ধা আমার মুখখানি ধরবার জন্যে হাত বাড়ালেন। অন্ধ, তাই আমাকেই ওঁর হাতের নাগালের ভেতর এগিয়ে যেতে হল। বৃদ্ধা আমার মুখে হাত বুলিয়ে চিবুকে হাত রাখলেন। তারপর স্থির হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকারের পার থেকে আলোর জগতে প্রবেশ করবার জন্য তাঁর সে কি আকুলতা! অন্ধচোখের মণি ছাপিয়ে শ্রাবণের ধারা নেমে এল। ছুটে এলেন শকুন্তলাদি। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে নিলেন জলের ধারা।

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বাবা অন্ধ করে দিয়ে ঈশ্বর আমার অশেষ উপকার করেছেন। খোকার মরা মুখ আমায় আর দেখতে হয়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা। কুমতির কাছেই শুনেছিলাম, শকুন্তলাদির স্বামী রোগমুক্তির পর পুরীতে এসেছিলেন চেঞ্জে, কিন্তু হঠাৎ খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ায় আর ফিরতে পারলেন না। তাঁর শেষ ইচ্ছা মাকে দেখবেন। কিন্তু মা তাঁকে ত্যাগ করেছেন, অতএব দেশে যাওয়া অসম্ভব। তাই টেলিগ্রাম গেল দেশে। মা এলেন দাসদাসী টাকাপয়সা নিয়ে। ছেলে আর মায়ের দেখা হল। মা কাঁদলেন ছেলের অসুখের জন্যে, আর ছেলে কাঁদল মায়ের অন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে। কয়েকটি দিন মা ছেলে বউ আর নাতি একসঙ্গে পুরীর সমুদ্রতীরে সংসার রচনা করলেন। তারপর একদিন সব শেষ হয়ে গেল।

বৃদ্ধা দাসদাসীকে সব পাঠিয়ে দিলেন দেশে। ছেলের বউ আর নাতিকে কাছ ছাড়া করলেন না। একদিন ছেলে আর বউকে

জাতিগত বাধায় ত্যাগ করে যে অন্যায় করেছিলেন, তার চরম প্রায়শ্চিত্ত করলেন সন্তানহারা হয়ে। এখন নাতি আর পুত্রবধূ অন্ধের নড়ি। আচার নিষ্ঠা কোথায় ভেসে গেছে। পুত্রবধূ মুখে জল দিলে তবে আচমন করবেন। রান্না করে দিলে তবেই করবেন অন্নগ্রহণ।

অনেক ক'টি পদই রান্না করেছেন শকুন্তলাদি। খেতে খেতে প্রশংসা করলাম। তাকিয়ে দেখি শকুন্তলাদির শাশুড়ীর মুখ তৃপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, বৌমা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, কি বল বাবা?

সায় দিলাম তাঁর কথায়। এদিকে খেতে খেতে আর এক কাণ্ড। সুমতি হঠাৎ বললে, কি সুন্দর তোমার শাড়ির আঁচলখানা শকুন্তলাদি।

এ ধরণের একটা বিশেষ মন্তব্যে শকুন্তলাদির দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। কিন্তু আমাকে বুঝি বোকা বানাবার চেষ্টা। তাই হেসে বললাম, সাদা থান কাপড়ের আবার আঁচলা তৈরী হচ্ছে নাকি আজকাল?

আমার কথা শুনেই ওরা তিনজনে কেমন যেন চমকে উঠল। তারপর বড় নেত্রের জ্যা আকর্ষণ করে এমন বাণ নিক্ষেপ করল যে আমি মুহূর্তে মূক হয়ে গেলাম। খাওয়ার পরে ওপরে গিয়ে ভগ্নী দুটির কাছ থেকে সঠিক ব্যাপারটা বোধগম্য হল। শকুন্তলাদির শাশুড়ী কোনমতেই চান না যে তাঁর পুত্রবধূ সাদা থান কাপড় পরুক। কিন্তু শকুন্তলাদি শুভ্র বৈধব্যের বেশ অঙ্গে তুলে নিয়েছেন।

আজকের ঘটনাটুকু শাশুড়ীর কাছে অভিনয় মাত্র। আমার বোনেরা শকুন্তলাদির শাড়ীর প্রশংসা করলে শাশুড়ীঠাকুরাণী অবশ্যই প্রীত হবেন, তাই এই ছলনা।

রাত পোহাল। আজ দুপুরে আমরা ভুবনেশ্বর ছেড়ে পুরীর পথে রওনা দেব।

ভুবনেশ্বরে আর কয়েকটি ঘণ্টামাত্র আমাদের অবস্থান। সকালে গেলাম লিঙ্গরাজ মন্দিরে। হিমালয়ের সহস্র শৃঙ্গের মাঝে এভারেস্ট যেমন সবার ওপর আত্মঘোষণা করছে, ঠিক তেমনি মন্দির-নগরী ভুবনেশ্বরের মাঝে লিঙ্গরাজ সমুন্নত শিরে জেগে রয়েছেন সবার ওপর। দশম শতাব্দীতে তৈরী হয়েছে লিঙ্গরাজের সর্বোচ্চ বিমান অংশটি। তারপর হয়েছে জগমোহন। নাটমণ্ডপ আর ভোগমণ্ডপ হয়েছে ত্রয়োদশ শতকে। লিঙ্গরাজের দিকে তাকালে একটি ঐশ্বর্য মূর্তি চোখে পড়ে। যেন মাটির কামনা আকাশকে স্পর্শ করতে চায়। লিঙ্গরাজের বিমান দেহে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর ঊর্ধ্বমুখী নমস্কার নিবেদন করছে আকাশের কোটি চন্দ্রভানুকে। লোকালয় দেবালয়ের পার্থক্য ঘুচিয়ে লিঙ্গরাজ দাঁড়িয়ে আছে অনন্তকাল ধরে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের সুবিশাল অঙ্গনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন বিগ্রহ রয়েছে তাদের মধ্যে। জগমোহনে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী কায়ারূপ লাভ করেছে। তরুতে দেহভার ন্যস্ত করে লীলাভরে দাঁড়িয়ে আছে তরু-তরুণী। ভারতীয় ভাস্কর্যের বিশিষ্ট রীতিতে রচিত পীবর বক্ষ আর পৃথুল নিতম্ব সমস্ত মূর্তিগুলিকে অনন্য শ্রী ও সৌষ্ঠব দান করেছে।

ঐ যে দর্পণধারিণী কন্যা। রূপ দেখে যেন আর আশ মেটে না। মুখকমলের ছায়া পড়েছে মুকুর-সরসীতে। এ অভিসারের প্রস্তুতি। দর্পণ যে প্রেমিকের নয়ন। সে নয়নে প্রণয়িনী নিজের রূপকে সহস্র ভঙ্গিমায় নিচ্ছে পরীক্ষা করে। পার্বতী মন্দিরের দেহে কাজগুলি আরও সূক্ষ্ম। শিল্পী কি অসীম ধৈর্যে এই আনন্দের ফুলগুলি রচনা করে গেছেন। বছরের পর বছর মন থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়েছে মধু। সেই মধু থেকে কায়ারূপ লাভ করেছে মর্মর মূর্তিগুলি। মন্দিরের ভেতরে প্রায়ান্ধকার অঙ্গনে ঢুকলাম। ভুবনেশ্বরকে দেখলাম, স্পর্শ করলাম। দেবতা অরূপ রতন, তাই

বাইরে নেই তাঁর রূপের প্রকাশ, মনের মন্দিরেই তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তি আর বিশ্বাসের সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই তাঁর মন্দিরের দ্বার যাবে খুলে। দেবতার ঐশ্বর্য-মূর্তি শুধুমাত্র সেই লগ্নেই হবে প্রত্যক্ষীভূত। পার্বতী মন্দিরে গেলাম। দেখি, শকুন্তলাদির ছেলে ভোলানাথ ঠাকুরমার আঁচল ধরে পাক খাচ্ছে, আর অন্ধ বৃদ্ধা তাকে ধরবার জন্যে শূন্যে হাত বাড়াচ্ছেন। এস দাদুভাই, এস এস গোপাল আমার, কোলে এস ভাই। কিন্তু ভোলানাথ একটা মজার খেলা পেয়েছে। ধরা না দিয়েও আঁচল ধরে ঘুরে চলেছে সে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের দিকে চোখ পড়ল। একটি আবর্তিত লতার মাঝে কয়েকটি ক্রীড়ারত শিশুমূর্তি।

ভোলানাথের মন্দির প্রাঙ্গণে খেলায় মেতে উঠেছে শিশু ভোলানাথ। বিশ্বভুবনের অধীশ্বর আজ শিশুমূর্তি ধরে যেন আপন অঙ্গনে ক্রীড়ায় প্রমত্ত।

পার্বতী মন্দিরের পাশে মাটিতে গললগ্নীকৃতবাসে নতজানু হয়ে বসে রয়েছেন শকুন্তলাদি। মুখে অপার স্থৈর্য। কতদিন, কতরাত্রি আশার প্রদীপ জ্বেলে প্রদক্ষিণ করেছেন প্রেমের দেবতাকে। কিন্তু সে দীপ নিভে গেছে। বাহিরের দৃষ্টি থেকে প্রেমের সে প্রতিমা গেছে সরে। এখন শুরু হয়েছে পার্বতীর নব পর্যায়ের সাধনা। অনন্ত অন্ধকারের মাঝে আত্মলীন হয়ে গেছেন তিনি। আঁধারের পারে কোন জ্যোতির্ময়ের আভাস কি তিনি পেয়েছেন ?

ফিরে এসেছি মন্দির থেকে। শেষ প্রণাম নিবেদন করলাম বৃষভ স্তম্ভের তলায়। উঠে দাঁড়াতেই একটি প্রশ্নের উত্তর মিলে গেল। ভুবনেশ্বরের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, নতুন কিছু লিখুন, কোনারক, ভুবনেশ্বর, পুরী যে পুরোনো হয়ে গেল।

সেদিন শুধু বলেছিলাম সবিনয়ে, অনেকের চলার পথে চলা যত সহজ, নতুন পথ করে যাওয়া ঠিক তত সহজ নয়। তাই পুরোনো পথেই নিরাপদ যাত্রা করতে চাই।

আজ এই মন্দিরে আমার ক্ষুদ্র প্রণামটি নিবেদন করতে গিয়ে একটি নতুন সত্য উপলব্ধি করলাম।

বিশাল মন্দিরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যে সুদূর অতীত তার সাক্ষ্য রেখে গেছে, সেই শত সহস্র বর্ষের পিতামহ অতীতকে অনুভব করলাম আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে। কত মানুষ তাদের প্রণাম এঁকে গেছে এ মন্দিরের মৃত্তিকায়। তারপর তারা লীন হয়ে গেছে অন্য কোন লোকে। কিন্তু মন্দিরের মাটিতে আজও প্রণামের মন্ত্র লেখা হয়। সেই নিত্যকালের পুরাতনের কথা কেমন করে পুরোনো হতে পারে। সহস্র কোটি ভক্তের প্রণামে সঞ্জীবিত এর সত্ত্বা। তাই আমার পূর্বে যাঁরা এই মন্দিরের কথা লিখে গেছেন, তাঁরা পারেননি সব কথার শেষ লিখে যেতে। আমার অতীত, আমার বর্তমান আর আমার অনাগত ভবিষ্যতের রূপদর্শীরা একে দেখেছেন, দেখছেন আর দেখবেনও। সর্বকালের মানুষের কাছে এই পুরাতন তিলে তিলে নতুন মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করছে অনন্ত আনন্দে।

দুপুরের দিকে বাসে এসে বসলাম। মন্দিরের পাশেই পুরীগামী বাসের স্ট্যাণ্ড। সকাল থেকে মন্দিরে যাত্রীদের আসাযাওয়া, পাণ্ডাদের টানাটানি চলে। কিন্তু ঠিক এই দুপুরের দিকটাতে চারদিক কেমন যেন ঝিমিয়ে আসে। যাত্রীরা যে যার আস্তানায় এ সময়ে বিশ্রাম নেয়, তাই পাণ্ডাদের ঘোরাঘুরি থাকলেও তেমন কোলাহল থাকে না। টিকিট কেনা ছিল আগেই, তিন-জনে গিয়ে বসলাম ড্রাইভারের ঠিক পেছনের সীটে। যথানির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করছি, অর্থাৎ বাস ছাড়বার পূর্ব ঘোষিত সময়টির কথা স্মরণ করে বারে বারে হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু মহাকাল বাস পরিচালকদের কথা রক্ষার সুযোগ না দিয়ে এগিয়ে চললেন। মহাকাল যাতে বেশীদূর অগ্রসর না হতে পারেন এবং বাস পরিচালকরাও কথা-ভঙ্গের কলঙ্ক থেকে রক্ষা পায় সে জন্য সমবেত বাসযাত্রীরা পরিচালকদের বিপুলভাবে উৎসাহিত করতে লাগলাম। কিন্তু হায়, কা কস্য পরিবেদনা। বাস চালক ও কণ্ডাক্টর মহোদয়ের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ কর্মেন্দ্রিয়গুলি সহসা বিকল হয়ে গেল। সহস্র আহ্বানেও আর সাড়া পাওয়া গেল না। অবশেষে কালের গতিকে দুর্বার ভেবে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে রইলাম।

এক সময় লটবহরসহ একদল গ্রাম্য বৃদ্ধা এল বাসের কাছাকাছি। তাদের সঙ্গে এক মুখপাত্র, তীর্থস্থানে পথ-প্রদর্শক বলে মনে হল। এবার কণ্ডাক্টর আর ড্রাইভার তাদের লটবহর

গাড়ীর ওপর তুলতে লাগল তড়িৎ-তৎপরতায়। ভাবলাম, গাড়ী নড়বে। কিন্তু আমাদের সব আশা নির্মূল করে ঐ প্রৌঢ় মুখ-পাত্রটি মালের বহন খরচা সম্বন্ধে কণ্ডাক্টরের সঙ্গে বচসা জুড়ে দিলে। একপক্ষ দামের আগুন জ্বালে, অন্যপক্ষ তার ওপর একেবারে ঠাণ্ডা জল ছিটোয়। এমনি করে বচসা শনৈঃ শনৈঃ এগুতে লাগল। আর আমরা কয়েকজন যাত্রী অনন্যোপায় হয়ে পাশ্চাত্যের সময়ানুবর্তিতার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা মূলক আলোচনা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে করে চললাম। ওদিকে প্রৌঢ়টি একে একে বৃদ্ধাদের গাড়ী থেকে নেমে আসতে বলল। ভাবলাম, আপদ বিদেয় হল, কিন্তু বাস যে নড়ে না!

ড্রাইভার ক্রমাগত স্টার্ট দিচ্ছে, কিন্তু নিষ্ফল গর্জন। পেছুটান রয়েছে, এগুবেই বা কেমন করে। এদিকে বৃদ্ধারা মুখপাত্রটিকে উত্যক্ত করতে লাগল। আর একটি বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে তাদের ধৈর্য এবং দৈহিক সামর্থ্য দুটিই গত হবে। অতএব মাঝামাঝি রফা হল। আবার এতগুলি প্রাণীর উত্থানপর্বে প্রায় সিকি ঘণ্টা সময় কাটল। এবার সগর্জনে বাস চলল এগিয়ে। বাসের ভেতরে চলাচলের পথেই বহু যাত্রী বসে পড়েছে। পূর্ণ গহ্বর, বাস কিন্তু চলতে লাগল পূর্ণোদ্যমে।

মন্দির পার হয়ে হঠাৎ এক জায়গায় এসে চক্রযানটি থেমে গেল। চেকার সাহেব মাথা ও টিকিট মিলিয়ে দেখবেন এখানে। গণনা আর শেষ হয় না। কয়েকবার গাড়ীর এপাশ ওপাশ দৌড়ে জানালা দিয়ে শ্রীমুখখানি ঢুকিয়ে অঙ্কশাস্ত্র আবৃত্তি করে চলল। নাঃ, এবার সত্যিই বিরক্তির কারণ ঘটল। টিকিটের সংখ্যার চেয়ে যাত্রীর সংখ্যা বেশী হচ্ছে। কোন মহাজন নিশ্চয় বিনা টিকিটে ভ্রমণ করছেন।

অবশেষে সবাইকে নিজের নিজের টিকিটগুলো টেনে বের করতে হল। মনে মনে সেই টিকিটহীন যাত্রীটির ওপর মহা ক্ষুব্ধ

হয়ে উঠলাম। মহাত্মা কতক্ষণে ধরা পড়লেন। চেকারের ধমক শোনা গেল। পেছনের সিটগুলোতে এত ভীড় যে তাঁর শ্রীমুখখানি দেখতে পেলাম না। গলা শুনে মনে হল, একটি অল্পবয়সী ছেলে এই দুষ্কর্মটি করেছে। ছেলেটির মোটামুটি বক্তব্য হল, সে খানিক দূর গিয়েই নাকি নেমে পড়ত। কিন্তু কে সে কথা বিশ্বাস করবে। এমন উদ্দেশ্যহীন যাত্রা যে একেবারেই অর্থহীন। তা ছাড়া টিকিট নেই, বাস যাত্রার সখ কেন বাপু। নির্মমভাবে চেকার তাকে বাসের গহ্বর থেকে টেনে বার করলে পথের ওপর। মহাত্মার শ্রীমুখখানা এবার দেখতে হয়। উঁকি দিলাম। পরক্ষণেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম দরজা খুলে। গোপাল তার ময়লা কাপড়ের এক প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছছে, চেকার তাকে তর্জনী তুলে শাসন করে চলেছে।

চেকারকে বললাম, এই পথটুকুর জন্য কত ভাড়া চাও ?

সে কিছু বুঝতে না পেরে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। দ্বিতীয়বার পুনরুক্তি করতেই সে আমতা আমতা করে একটা ভাড়ার অঙ্ক বললে। ব্যাগ থেকে তার হাতে তাই দিতে গেলাম। যাত্রীরা হাঁ করে রইল। আমার বদান্যতায় চেকার সাহেব লজ্জা পেয়ে কিছুতেই আর ভাড়াটা নিতে চাইলে না।

গোপাল আমাকে দেখে মনে হল কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, এমন করে আসতে গেলে কেন গোপাল ?

সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল লজ্জা আর গ্লানিতে সে কাঁপছে। আর দেরী করা চলে না। গোপালকে আশ্বাস দিলাম, আবার এলে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দেখা করব গোপাল। কোনদিন তোমার আর তোমার মায়ের কথা আমরা ভুলব না।

গাড়ীতে এসে বসলাম। নির্দিষ্ট পথ ধরে গাড়ী এগিয়ে চলল।

কত মাঠ ঘাট প্রান্তর পেছনে হারিয়ে গেল, আর তার সঙ্গে হারিয়ে গেল উৎকলের একটি সুকুমারমতি সলজ্জ কিশোর মূর্তি।

যতক্ষণ না গাড়ী অদৃশ্য হয়ে যায় ততক্ষণ বেশ বুঝলাম দুটি সজল চোখ তাকে অনুসরণ করল। তারপর একটি ছোট্ট পাখির মত কোমল মন সারা পথ চলতে লাগল আমাদের সঙ্গী হয়ে।

উড়িষ্যার গাছপালা, পথপ্রান্তর, নদীনালা সবই বাংলা দেশের মত। কোথাও একটু পার্থক্য খুঁজে পাওয়া ভার। দেশের প্রকৃতিতে এমনই যদি মিল থাকে তাহলে বিভিন্ন প্রদেশবাসী বলে তাদের মনে এতখানি গরমিল থাকবে কেন! এইসব সাত সতেরো চিন্তা আসছে মনের মধ্যে। গাড়ীতে বসলেই এ সব ভাবনাগুলো আসবে অনিবার্যভাবে। কিছুক্ষণ নিজেদের ভেতর কথাবার্তা চলে, তারপর এককভাবে পথের বৈচিত্র্য দেখতে থাকে মানুষ। তারও পরে ভাঙা টুক্‌রো চিন্তার রাজ্যে ডুব দেয় সে। তখন পথের পাশে বিরাট পুকুরটি একবার চমক দিয়েই সরে যায়। কত মাঠ ঘাট, গাছপালা ছায়াছবির মত চোখের ওপর দিয়ে ভাসা ভাসা ভাবনার রাজ্য পার হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে।

গাড়ী এসে থামল এক জায়গায়। লটবহর নামল গাড়ীর থেকে, আবার তারা মানুষের কাঁধে মাথায় চেপে চলল গাঁয়ের পথ ধরে।

একসময় কুমতি কথা বললে, দাদা এমন নীরব কেন?

কলরব করবার মত কোন উপকরণ নেই বলে।

ও আবার বললে, নতুন জায়গা দেখে আনন্দ হচ্ছে না?

সুমতি ফোড়ন কাটলে, মূর্খ, এই সাধারণ কথাটা বুঝলি না, আনন্দে আত্মহারা হলে তার আর বহিঃপ্রকাশ হয় না। দাদা আমাদের সেই আনন্দে মজে গেছে।

মাথায় চাটি মেরে বললাম, দাদার সঙ্গে রসিকতা করা হচ্ছে ডেঁপো মেয়ে। এতক্ষণ তাহলে নিজে চুপ করে ছিলে কেন শুনি?

বলি, কোন পরদেশীর ধ্যানে এতক্ষণ প্রাণের পাখি পাখা টেনে উড়ছিল ?

কুমতি সুমতির পিঠে হাত রেখে বললে, কেন ভাই দাদাকে খোঁচাতে গেলি, সংগোপনে কাজ সেরে নিচ্ছিলি, সে ভালই ছিল, এখন নিজেব দোষেই হাটেব মাঝে হাঁড়িটা ভাঙবার ব্যবস্থা করে দিলি।

এবার কুমতি অতি ধীরে গান জুড়ে দিলে,

'মোব ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো
দোলে মন দোলে অকারণ হবষে—'

সুমতি বাগত স্ববে বললে, তোর গান শুনলে কি মনে হয় জানিস ?

হেসে বললে কুমতি, কি ? সুমতির মুখে কবিতা,

বুঝি বিন্নুসীটের গাধা
গলা সাধে সাবে গামা পাধা।

কবিতার মিলে কেউ কম যায় না। কুমতি অমনি মিল দিলে,

তোর কবিতা শুনলে মনে হয়
তুই কালিদাসের গৃহিণী নিশ্চয়।

সুমতি সোচ্ছ্বাসে বললে, সে তো পরম সৌভাগ্যের কথা রে। কুমতি অমনি মুখ বেঁকিয়ে একটি অদ্ভুত উচ্চারণ কবে বললে, ম্যাগো, কবি দেখলেই মনে হয়,

'ললিত লবঙ্গলতা
পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে'—

বললাম, তোমার হেড-অফিসটা একদম বেঠিক হয়ে গেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস এঁরা বুঝি ললিত লবঙ্গলতা ? জিভ কেটে কুমতি বললে, ভুল বলেছি, মাপ করুন জাঁহাপনা। আমি শুধু তথাকথিত লতিয়ে চলা বাবরী চুলো কবিদের বলছিলাম।

সুমতি হাঁকলে, ফের বাবরীর ওপর বিরূপ মন্তব্য? ব্যক্তিগত রুচির ওপর মন্তব্য করেছ কি মরেছ।

কুমতির কণ্ঠে গান,

'মরিব মরিব সখি
নিশ্চয় মরিব
তোমা হেন গুণনিধি
কারে দিয়ে যাব'?

আমার ভাবনা আর তোমার ভেবে কাজ নেই, নিজের চরকাটিতে তেল দাও গে যাও, গানের শেষে সুমতির জবাব।

বললাম, একটা গল্প শুনবে?

তুজনেই অমনি বিপুল উৎসাহ প্রকাশ করে বসল।

বললাম, এ গল্প কিন্তু অতি সাধারণ, অথচ চিরদিনের।

কুমতি বলল, ভণিতা রেখে আসল গল্পটা এখন শুরু করুন দেখি মহারাজ।

গল্পটি তুই ব্রাহ্মণকে নিয়ে। তাদের একজন উচ্চ অপর জন নিম্ন শ্রেণীর। মাঝে তাদের একটিমাত্র প্রতিশ্রুতি। আর সেই প্রতিশ্রুতির পরিণতিতেই গল্পের সমাপ্তি।

ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে মনোরম স্বপ্ননগরী কাঞ্চী। সেই নগরীতে আরও একটি মধুরতর স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল এক সময়। সে স্বপ্নের নায়িকা এক উচ্চ বংশীয় বিপ্রকন্যা, নায়ক নিম্নবংশোদ্ভব কুমার। কন্যার পিতা বিপুল বিত্তের অধিকারী, সুতরাং সমাজে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে যুবকটির নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কেটে যায়। তবু এই ধনবৈষম্যের ভেতরও বিত্তবান ব্রাহ্মণের গৃহে ছিল তার অবারিত দ্বার। ব্রাহ্মণ এই দরিদ্র অথচ কান্তিমান যুবকটিকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন। এই আসা যাওয়ার পথের ধারে এক অভাবিত লগ্নে প্রণয়ের ফুল ফুটল; পথিক মধুকর প্রেমে প্রমত্ত হল।

অন্তঃপুরচারিণী বিপ্রকন্যার চরণের নূপুরধ্বনি সেদিন যুবকের কাছে মনে হতে লাগল সারা দাক্ষিণাত্যের শত সহস্র ঝর্ণার ঝঙ্কার। আভাসে ইংগিতে ইসারায় দুটি হৃদয় জানল পরস্পরকে। কিন্তু অভ্রভেদী সমাজের বাধাকে অতিক্রম করে তারা পেল না পরস্পরের নিকটতম সান্নিধ্য।

তারপর কোন একদিন ধনী ব্রাহ্মণের মনে জাগল একটি বাসনা। তিনি সে আকাঙ্খার কথা জানালেন দরিদ্র যুবকটিকে। যুবক প্রস্তুত। বৃদ্ধ যথোপযুক্ত অর্থ নিয়ে যুবকটির সঙ্গে চললেন ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমায়। তাঁরা পদব্রজে পুরী, গয়া, কাশী অতিক্রম করে একদিন পৌঁছলেন বৃন্দাবন ধামে। লীলাভূমি বৃন্দাবন। পথের ধূলায় প্রেমের পদ্মরেণু বিছিয়ে রেখেছেন রাধামাধব। বৃন্দাবনের শুকসারী কৃষ্ণরাধার লীলাগানে মুখর। যমুনার জলে কৃষ্ণ প্রেমের কথকতা। যুবক তার মানসীর জন্যে অনুভব করল তীব্র বেদনা। হয়ত প্রেমের দেবতা শুনতে পেলেন বিরহী হৃদয়ের সেই দীর্ঘশ্বাস।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ব্রাহ্মণ, এখন একেবারে শয্যা নিতে হল। পরিবার পরিজন রয়েছে বহুদূরে। আকাঙ্খা থাকলেও তাদের সেবা পাবার কোন সুযোগই ছিল না তাঁর। এ ক'দিন তিনি কেবলই ভেবেছেন সংসারের কথা। ব্রজবল্লভ গোপালের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন, ঠাকুর আমার সংসারে মঙ্গল কর, আমার কন্যাকে অর্পণ কর সুপাত্রে, লক্ষ্মী যেন নিত্য অচলা হয়ে থাকেন আমার গৃহে।

প্রভু গোপাল হেসেছেন মনে মনে। তাঁর মনের অভিলাষ মানুষের অপরিজ্ঞাত।

বৃদ্ধ স্বজনহীন প্রবাসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুঃসহ ব্যথায় দুর্বিষহ মনে হতে লাগল তাঁর জীবন। রাজহংস শোভিত দীর্ঘিকার

তীরে সুরম্য প্রাসাদের ছবিটি বার বার ভেসে উঠতে লাগল তাঁর চোখের সামনে। মনে পড়ল মাতৃহারা কন্যার মুখ। চোখের জল পড়ল সে ছবির ওপর। দরিদ্র যুবকটি বৃদ্ধের সেই দুর্দিনে নিয়ে এল অপার সান্ত্বনা। সেবায় যত্নে সে তখন অক্লান্ত। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি কবলেন মানুষেব মধ্যে দেবতার আবির্ভাব। জাতির আর শ্রেণীর গণ্ডীতে ক্ষুদ্র করে রাখা যায় না সত্যকার মানুষকে। একদিন যুবকের ক্লান্তিহীন সেবার শেষ হল। বৃদ্ধ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এবাব গৃহে ফিবে যেতে হবে। তাঁবা এলেন গোপালের মন্দিরে শেষ প্রণাম নিবেদন কবতে। সন্ধ্যারতিব ঘণ্টা বেজে চলেছে। আবতির দীপালোকে বৃদ্ধ দেখলেন প্রেমাবতার গোপালের মুখে মৃদু হাসি। পাশে তাকিয়ে দেখলেন, যুবকের মুখেও সেই হাসির আভাস।

বৃদ্ধ সেই পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। ভুলে গেলেন তিনি উচ্চবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ। গোপালকে সাক্ষী রেখে কথা দিলেন, আপন কন্যাকে সম্প্রদান করবেন এই নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র যুবককে। যুবক প্রবাসে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছে। এ হল তারই পুরস্কার।

আনন্দে অধীরতায় যুবক বার বার মনে মনে প্রণতি নিবেদন করল প্রেমের ঠাকুর গোপালকে।

এরপর তাঁরা ফিরে এলেন স্বদেশে।

কিন্তু এ কি হল। স্বজনের মাঝে ফিরে এসে বৃদ্ধ পূর্বভাব ফিরে পেলেন। নিম্নশ্রেণীর হাতে কন্যাদান যে একেবারে অসম্ভব। পরিজন যে এ দুষ্কর্মের জন্যে তাঁকে পরিত্যাগ করবে।

বৃদ্ধের এই মানসিক উদ্বেগের দিনে যুবক একদিন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা, যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে গোপালের বিগ্রহের সামনে।

ব্রাহ্মণ সমস্ত অস্বীকার করে বসলেন।

যুবক সহজ বিশ্বাসে তখন উপস্থিত হলেন রাজদ্বারে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী ব্রাহ্মণ। তাঁর বিচার চাই। রাজদরবারে ব্রাহ্মণ তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বললেন, দরিদ্রের এতদূর স্পর্ধা তাঁর কল্পনারও অতীত।

রাজা যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ যে তোমাকে বাক্যদান করেছেন, তার সাক্ষী রয়েছে কে ?

গোপালই তার সাক্ষী মহারাজ।

রাজা বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, তবে নিয়ে এস তোমার গোপালকে এখানে। তোমার পক্ষে তিনি সাক্ষী দিয়ে যাবেন।

সহজ বিশ্বাসী কুমার ফিরে গেল বৃন্দাবনে। গোপালের মন্দিরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। তুমি আমার প্রেমের মর্যাদা রক্ষা কর ঠাকুর। শ্রীমতীর শতবর্ষের দুঃখ তুমি দূর করেছিলে, আমার অসহ প্রেমের বেদনাকে তুমি দূর কর।

যুবক শুনতে পেল এক অকল্পনীয় উত্তর। তার প্রাণের ঠাকুর গোপাল তাকে অভয় দিয়ে বললেন, আমি যাব তোমার সঙ্গে। প্রেমের অপমান যেখানে, সেখানে যে আমারই পরাজয়। কিন্তু একটি সর্ত থাকবে আমাদের মধ্যে। তা হবে আমার প্রতি তোমার বিশ্বাসের পরীক্ষা।

কি সর্ত ঠাকুর ?

তুমি আমায় নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে, আমি চলব তোমাকে অনুসরণ করে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তুমি পেছন ফিরে আমাকে দেখবার চেষ্টা করো না। পথ চলতে তুমি শুনতে পাবে আমারি পায়ের নূপুরধ্বনি।

যুবক আনন্দে আত্মহারা। এগিয়ে চলল কাঞ্চীর পথে। নূপুরের ধ্বনি তুলে তাকে অনুসরণ করে চললেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীমাধব। কত পথ, কত প্রান্তর তাঁরা পেছনে ফেলে এলেন। যুবক নিরন্তর শুনছে সেই অদৃশ্য নূপুর নিক্কণ। আনন্দে তার হৃদয়ের

তারে উঠছে ঝঙ্কার। কত আশা আর স্বপ্ন তার সার্থক হতে চলেছে এতদিনে। আর বেশীদূর নেই, পথ শেষ হয়ে এল। এবার সামনে পড়ল এক নদী।

গ্রীষ্মের উত্তাপে শুষ্ক হয়ে গেছে তার জলধারা। স্বর্ণ বালুরাশি দু'কূলে বিস্তৃত হয়ে আছে, যেন সোনার পালঙ্কে রাজকন্যা অচেতন ঘুমে রয়েছে ঘুমিয়ে। যুবক অবলীলায় পেরিয়ে গেল শুষ্ক নদী। কিন্তু একি হল! সে যে আর শুনতে পাচ্ছে না নূপুরের ধ্বনি। হতাশায় ভেঙে গেল তার বুক। তাহলে কি গোপাল তার অনুসরণে বিরত হল। যুবক বুঝতে পারল না যে বালুরাশি পার হতে গিয়ে নূপুর তার ধ্বনি হারিয়েছে। উৎকণ্ঠার কাছে যুবক অবশেষে আত্মসমর্পণ করল।

তুমি কি আসছ ঠাকুর, বলতে বলতে যুবক পেছন ফিরে তাকাল গোপালের দিকে।

হাঁ, এই যে গোপাল। হাতে বেণু, চরণে নূপুর, মুখে মৃদু হাসি। কিন্তু কাছে গিয়ে যুবক ভাল করে দেখল গোপাল চিরতরে মূক পাষাণে পরিণত হয়ে গেছেন।

কিছু সময় চুপ করে থাকতে দেখে কুমতি বললে, তারপর কি হল দাদা?

আর কি হবে। উদ্‌ভ্রান্ত যুবক ছুটে গেল মহারাজের দরবারে। সেই ঘটনাই সে অকপটে বর্ণনা করল রাজার কাছে। সপারিষদ রাজা এলেন যুবকের কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করতে। ব্রাহ্মণও রইলেন তাঁদের সঙ্গে।

ঘটনাস্থলে এসে সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে আদেশ করলেন নিম্নশ্রেণীর যুবকের হাতেই তাঁর কন্যা সম্প্রদান করতে।

তারপর মহা সমারোহে গোপালের বিগ্রহকে ঘিরে গড়ে উঠল সুরম্য মন্দির। সাক্ষী দিতে এসে গোপাল হলেন চিরবন্দী।

কণ্ডাক্টর হাঁকল, সাক্ষী গোপাল। পুরীর পথে আমরা এতক্ষণে সত্যই সাক্ষী গোপালে এসে পৌঁছলাম। সাক্ষী গোপালের নামেই এ অঞ্চলটির নামকরণ করা হয়েছে। মন্দিরে গোপাল এবং শ্রীরাধার মূর্তি রয়েছে। উৎসবের দিনে এখানে দলে দলে যাত্রী আসে। তারা গোপালের কাছে তাদের মানস কামনা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে।

সুমতি বললে, গল্পের শেষটুকু প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ শ্রীমান দাদা-মহাশয়ের সংযোগ।

কুমতি বললে, তুই থাম, ভুল মানুষেই করে। সে ছেলেটিও না হয় ভুল করে তাকিয়েছে। তাই বলে মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে হবে না, তাও কি হয়।

বললাম, ডাক্তারী ডিসেক্সন করা যার বৃত্তি, সে সব কথা বিশ্লেষণ করে দেখবে এতে আর আশ্চর্য কি কুমতি।

খোঁচা দিলে কুমতিও, যা না তুই একবার মন্দিরে, মনস্কামনাটা জানিয়ে আয়। দেখবি ঠাকুর তোর মনের দুরাশাগুলোর একটা সুরাহা করে দেবেন।

কিছুক্ষণ সেখানে থেকে গাড়ী আবার গর্জন করে উঠল। তার আর্ত আওয়াজে ডুবে গেল আমাদের সব কথা। কতক্ষণ গাড়ী চলল একটানা। এক সময় জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে পেছন ফিরে দেখলাম, কতকগুলি যাত্রী গাড়ী থেকে যুক্তকরে নমস্কার জানাচ্ছে। দূরে তাকাতেই চোখে পড়ল দেব জগন্নাথের মন্দির শীর্ষ। সূর্যাস্ত হয়েছে অল্পক্ষণ। হেমন্তের বিষণ্ণ দিনান্ত একটি ম্লান আলোক বিছিয়ে দিয়েছে পথ প্রান্তরে। প্রকৃতির এই মৌনী মুহূর্তে সমস্ত অন্তর জগন্নাথের উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম হয়ে লুটিয়ে পড়ল। গাড়ী ছুটে চলেছে, কাছে এগিয়ে আসছে জগৎপতি জগন্নাথের মন্দির। ভেসে উঠল একটি ছবি। আজ থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে দিব্য-ভাবে বিভোর এক মানব ছুটে চলেছেন জগন্নাথের দেউল লক্ষ্য

করে। কণ্ঠে তাঁর অমিয় সংগীত—'জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে'—স্বামী জগন্নাথ, আমার নয়ন পথের সম্মুখে তুমি আবির্ভূত হও।

প্রেম-পাগল পথিক ছুটে আসছেন বাংলা থেকে উড়িষ্যায়। কণ্ঠে হরিগুণ গান। সংসারে এসে যা কিছু আমি পেয়েছি তার সবটুকু জীর্ণ বস্ত্রেব মত ফেলে এলাম, এখন শুধু তোমার দেওয়া প্রেমটুকুই সম্বল। তুমি তাকে গ্রহণ কর। প্রিয়ার অশ্রুমূর্তি, জননীর বাৎসল্য, পরিজনের প্রীতি, সবই আজ এক হয়ে তোমার মাঝে মিলেছে। তাই আমার সব কামনা তোমাকেই কেন্দ্র করে। আমার সংকীর্তন সেই আনন্দের উৎসার। লক্ষ লক্ষ জীবেব প্রাণের প্রদীপ তোমাকে ঘিরে এক দীপাবলীর উৎসবে প্রমত্ত হবে। সেই উৎসবের দেবতা তুমি জগন্নাথ। আমি সেই প্রেম-প্রদীপের অগ্নি প্রজ্জ্বলনের ভারটুকু নিয়েছি মাত্র। আমি তোমার দাসানুদাস সেবক গৌরাঙ্গ।

এই আনন্দময় আত্মার সঞ্চরণে উৎকলের পথরজ একদিন চন্দন চূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সার্বভৌমের সর্ব অহংকার সেদিন লুটিয়ে পড়েছিল শ্রীচৈতন্যের চরণ ধূলায়। দারু দেবতা জগন্নাথের সার্থক হয়েছিল দীনবন্ধু নাম। আদ্বিজচণ্ডাল প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে পরস্পরকে একই জগন্নাথের সেবকরূপে ভাবতে শিখেছিল। সারা বালুখণ্ডের স্বর্ণাভ বেলাভূমি আজও সেই প্রেমের ঠাকুরের পূত পাদস্পর্শে পরমতীর্থ হয়ে আছে।

সন্ধ্যার বাতি জ্বলে উঠছে একে একে। আমাদের গাড়ী এসে ঢুকল পুরী সহরে। গাড়ী থেকে নামলাম। আবার উঠলাম লটবহর নিয়ে সাইকেল রিকসায়। দু'একটা সংকীর্ণ গলি পার হয়ে হঠাৎ রিকসা আমাদের নিয়ে যেখানে এসে থেমে গেল তারপর আর সামনের পথ নেই। অনন্ত জলরাশির অশান্ত কল্লোল। আস্তানা পাতলাম 'ওসেন ভিউ' হোটেলে। কলকাতা

থেকেই চিঠিপত্র লিখে প্রায় ঠিকঠাক করে রেখেছিলাম। ঘর মিলল ওপরে। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত মিলে গেল, সামনের একটি ছাদ।

সন্ধ্যায় বেশবাস পরিবর্তন করে কিছু জলযোগের পর এসে বসলাম ছাদে। তিনটি চেয়ার নিয়ে বসেছি সমুদ্রের মুখোমুখি।

নির্মল আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের ভৃঙ্গার থেকে গড়িয়ে পড়ছে আলোর সুধা। সেই সুধা পরম আনন্দে পান করছে সমুদ্র। ফেনায় ফেনায় তার খুশির উচ্ছ্বাস।

কুমতি বললে, দাদা, সফেন সমুদ্র দেখে আমার কিন্তু রঘুবংশের একটি শ্লোক মনে আসছে। অবশ্য এখানে চোখের সামনে যদিও কোন তটিনীকে দেখা যাচ্ছে না।

কুমতি আবৃত্তি করলে,

মুখার্পণেষু প্রকৃতিপ্রগল্‌ভাঃ স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ।
অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ॥

তরঙ্গ-অধর দানে সুদক্ষ সাগর
প্রকৃতি-প্রগল্‌ভ সেই প্রেমিক নাগর
তটিনীর মুখসুধা নিজে করি পান
আপন অধরসিধু করিতেছে দান।

সুমতি বললে, উপমাটি সত্যিই সুন্দর।

কুমতি বললে, মনে এল তাই বললাম। সেই কতদিন আগে পড়েছি। সেদিন শুধু শুকনো ব্যাখ্যাটুকু বুঝে নিয়েছিলাম অধ্যাপক মশায়ের কাছ থেকে। আজ যে সেই শ্লোক এমন করে সত্যকার সাগরে রূপ নেবে তা কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলাম।

সুমতি বললে, তোমাদের মত সংস্কৃতের বিদ্যে আমার নেই, তবে বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলার ভেতর সমুদ্রের ঐ শুভ্র ফেনরাশির একটি উপমা পড়েছিলাম।

ডাক্তার কবি হচ্ছে, তাই আমরা দুজনেই তাকালাম তার দিকে।

সোনার সৈকতে সাদা ফেণার রেখা, তাই দেখে মনে হচ্ছে যেন একটি সাদা ফুলের মালা, কাননকুন্তলা ধরণীর অলকাভরণ। বললাম, চমৎকার উপমা সুমতি। তবে আমার কি মনে হচ্ছে জান, সমুদ্র সব উপমাগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে। অনন্তকাল ধরে কি অশান্ত উচ্ছ্বাস তার। যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বের ভাবুকেরা ওকে কত বিচিত্র রূপে দেখবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যায়নি সমুদ্রের রূপ। কিছুক্ষণ আলোচনার পর বসে রইলাম চুপচাপ। এখন মনে হচ্ছে আলোচনার চেয়ে উপলব্ধি কত মধুর। হু-হু করে বাতাস বইছে। সমুদ্রের সেই একটানা সুর। দূরে নীল সিন্ধু আর নীলাকাশ এক হয়ে মিশে গেছে। আমাদের দৃষ্টির সীমানার ভেতর চাঁদের আলো যেখানে এসে পড়েছে সেখানটা কত উজ্জ্বল। শত শত হীরের টুকরো নিয়ে সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন লুফোলুফি খেলছে।

ঢেউএর ঝাঁক বেলাভূমির এখানে ওখানে আছড়ে পড়ছে। সত্যি এরা যেন কলহংসের ঝাঁক, সাদা পাখাগুলি মেলে কলরবে বালু বেলাকে উচ্চকিত করে তুলেছে।

এমনি কতক্ষণ বসে রইলাম। তারপর আরও কতদিন এসে বসলাম এই ছাদে, ঐ সমুদ্রতীরে বালুবেলায়। কত শঙ্খ ধবল ঢেউকে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম। ঐ লবণ সমুদ্রের পারের কোন দ্বীপ থেকে কোন কোন দিন লবঙ্গের সৌগন্ধ ভেসে আসত ; মনে মনে অনুভব করতাম তার আঘ্রাণ।

কতদিন দুঃসাহসী নাবিকের মত আমার মনের ময়ূরপঙ্খী সমুদ্র-সনাথ সপ্তদ্বীপ পার হয়ে চলে যেত যবদ্বীপ জাভা সুমাত্রায়। আমার স্বপ্নকে বিছিয়ে দিয়ে কবিগুরুর ভাষায় বলতাম, 'দেখ ত চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না'। কোন কোন দিন সহর ঘুরে সন্ধ্যায় যখন ফিরতাম তখন ঝাউবনের আড়ালে হঠাৎ পূর্ণচন্দ্রকে দেখতে পেতাম। ঝাউএর চাপা গুঞ্জনে, সমুদ্রের

কলধ্বনি মিলে কেমন যেন এক প্রতীক্ষামুখর প্রণয় পরিবেশ রচিত হত।

সুমতি হঠাৎ বলে উঠত, এই তো শুভযোগ। আবৃত্তি করত রবীন্দ্রনাথের কবিতা,

'যে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে
উৎসুক ধরণী—
সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তার তরঙ্গের ধন্য ধন্য ধ্বনি
মন্দ্রিয়া উঠিল কূলে কূলে'

হেসে বলত কুমতি, এখন যদি তোমার মনের মানুষ কাছে থাকত, তাহলে তোমার আবৃত্তির পরেই দুটি হাত ধরে বলত,

'সে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
তোমারে প্রথম দেখা দেখেছি জীবনে।'

এক একদিন বালু ভেঙে কতদূর চলে যেতাম। পশ্চিমে উঁচু নীচু বালিয়াড়ী পেরিয়ে যেতে যেতে একদিন আবিষ্কার করলাম এক পদ্ম সরোবর। এমন চমৎকার একটি ছবি দেখতে পাব ভাবতে পারিনি। সুমতি কুমতি বসে পড়ল পুষ্করিণীর ধারে। বললে, আর উঠতে ইচ্ছে করছে না দাদা।

বললাম, তাহলে পদ্ম সরোবর আগলে বসে থাক তোমরা।

কুমতি বললে, রাজী আছি।

সাবধান করে দিয়ে সকৌতুকে বললাম, কিন্তু এই পদ্ম সরোবরের মধুগন্ধী পবন সেবন করার বিপদ কি জান?

তা তো জানিনা!

মেঘদূতের যক্ষ প্রভুর কাজে অবহেলা করেছিল কেন জান? যে কারণে তাকে বিগতমহিমা হয়ে দ্বাদশ মাস বিরহ তাপ সইতে হয়েছিল?

কুমতি বললে, তা তো জানি না। মেঘদূতের আরম্ভে কেবল রয়েছে, স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে প্রভুর আদেশ অমান্য করেছিল বলেই যক্ষ অভিশাপ কুড়িয়েছিল।

বললাম, মেঘদূতের পেছনেও সামান্য একটু ইতিহাস রয়েছে। কোনদিন কি মনে জাগেনি তোমাদের কেন যক্ষকে এমন বিরহ দুঃখ সইতে হল, কি তার অপরাধ?

দুজনেই তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বললাম, তবে শোন।

হিমাচলের এক রম্য স্থান, সেইখানে গড়ে উঠেছে সুরম্য অলকাপুরী। সেই অলকাপুরীর অধীশ্বর ছিলেন ধনপতি কুবের। চির-যৌবনের অধিকারী যক্ষেরা ছিল তাঁর অনুচর। ধনপতি কুবের নিত্য ইষ্টদেব শঙ্করের আরাধনা করতেন। পদ্ম সরোবর থেকে সহস্রদল পদ্ম নিয়ে অঞ্জলি দিতেন ইষ্টদেবের চরণে। কিন্তু এক সময় এক বিপর্যয় এল। অরণ্য-বিহারী গজযূথ পদ্মের সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে নিশীথে আসতে লাগল সেই সরোবরে। পদ্মবনে তারা সারারাত্রি প্রমত্ত বিহার করত। উৎপাটিত হত সমৃণাল শতদল। তারপর রজনী শেষে তারা প্রস্থান করত অরণ্যে।

কুবের প্রভাতে দেখতেন ছিন্নপত্র বিক্ষত কুবলয়। তখন তিনি পালাক্রমে যক্ষদের পদ্ম সরোবর রক্ষার কাজে নিযুক্ত করলেন। সদ্য পরিণীত এক যক্ষের ওপর এক নিশীথে ভার পড়ল পদ্ম সরোবর রক্ষার। রাত্রি মধুমদির, চন্দ্রের সুধা পানের জন্য চকোরী ক্রন্দনরতা, পদ্মের গন্ধে প্রণয়ের মূর্চ্ছনা। সব কিছু মিলিয়ে যক্ষের হৃদয়কে অধীর করে তুলল। পদ্মের দিকে তাকিয়ে নবোঢ়ার মুখকমলের ছবি ফুটে উঠল তার চোখে। সে মাদক আমন্ত্রণকে যক্ষ উপেক্ষা করতে পারল না। নিশীথে চলল প্রিয়া সন্নিধানে।

তারপর যথারীতি মত্ত হস্তীর দাপাদাপিতে পদ্মবন ছিন্নভিন্ন হল। কুবের কুপিত হলেন। প্রভুর আদেশ অমান্য করবার জন্যে বিচারে প্রিয়া-মিলন সমুৎসুক যক্ষকে দ্বাদশ মাস রামগিরিতে নির্বাসন দেওয়া হল। অতএব আর যেখানে হোক, পদ্মবনে বেশী সময় বসো না, তাহলে প্রণয়-প্রসঙ্গে অভিশাপ কুড়োতে হবে।

সুমতি বললে, মশায়, সে ভয়টা আমাদের তরফের নয়, সে ভয় যদি থেকে থাকে তাহলে তা আপনাদের। আর যাই হোক যক্ষ নিশ্চয় মহিলা ছিলেন না।

কুমতি দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, তা ছাড়া মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী বিবেচক আর কর্তব্যনিষ্ঠ।

বললাম, এখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য, ভোটের জোরে তোমাদেরই জয়লাভের সম্ভাবনা। অতএব বুদ্ধিমানের মত এইখানেই নিবৃত্ত হওয়া ভাল।

ওদিকে রয়েছে কেয়াবন। একদিন গেলাম সেখানে। কণ্টকিত পাতার ফাঁকে শুভ্র কেয়াফুলের পাঁপড়ি। তার ভেতর পরাগ দণ্ড। পরিমলে লুব্ধ ভ্রমরেরা প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। ঘন ঝোপের মাঝে ফুলের সন্ধান করা দুষ্কর হয়ে উঠল। অসময় হলেও ফুলের দেখা মিলল। কুমতি চেঁচিয়ে বললে, ঐ যে দাদা, একটা সাদা ফুল দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু ওকে তোলা যায় কি করে। এত উঁচুতে রয়েছে, নামাতে গেলেই আকৃশী দরকার। কিন্তু কাছেপিঠে তা মেলা ভার। তাকিয়ে দেখলাম ওদের চোখেমুখে কেতকী পুষ্পের প্রলোভন চিহ্ন আঁকা।

অগত্যা বললাম, তুই সখী এই নির্জন কেতকী কাননে অবস্থান কর। আমি আকৃশীর সন্ধান নিয়ে আসছি।

সুমতি বললে, তোমার যেন আবার সেই নবকুমারের কাষ্ঠ সন্ধানে যাত্রা না হয়।

বললাম, বিলম্ব হলে নবকুমারকে বাঘে খেয়েছে মনে করে আবার যেন হোটেলে চলে যেও না।

কুমতি বললে, কথা দিলাম, যাবৎ সিদ্ধিলাভ না হয় তাবৎ এই বালুকাসনে বসে রইব।

বালুভূমিতে বসল দুই সখিতে আর আমি হতভাগ্য বালু ভেঙে চললাম যষ্টি সন্ধানে। কিছুপথ চলার পর সমুদ্রতীরে দেখতে পেলাম কতকগুলি তাঁবু। নুলিয়াদের কয়েকটা প্রায়-নগ্ন ছেলে বালুর ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে খেলায় মেতেছে। কাছাকাছি হতেই একটা উৎকট গন্ধ নাকে এল। সামনে পৌঁছে দেখলাম, কয়েকটি মেয়ে আর পুরুষে মিলে একটা বড় দড়িতে বহু মাছ গেঁথে চলেছে। ওপরে কয়েকটি বাঁশের মাথায় বাঁধা লম্বা লম্বা দড়ি থেকেও সার সার মাছ ঝুলছে।

জিজ্ঞেস করে জানলাম, এখানে ওরা শুট্‌কী মাছ তৈরী করছে। এটা হল নুলিয়াদের একটা 'খটি', অর্থাৎ শুট্‌কী প্রস্তুতের কারখানা। আমার আগমনের খবর পেয়ে ওরা পেছন ফিরে তাকাল। ছেলেগুলো খেলা ভুলে দেখতে লাগল নবাগত আগন্তুকটিকে। কয়েকটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে একহাত কোমরের বামপ্রান্তে রেখে অন্যহাতে রোদ্দুর আড়াল দিয়ে তাকাতে লাগল। আমি আরও কাছাকাছি হতেই একটি নুলিয়া কাজ ছেড়ে আমার কাছে উঠে এল।

আমার উদ্দেশ্যের কথা তাকে জানালাম। মনে হল মাছধরা ছাড়া পৃথিবীর মানুষ যে ফুল তোলা বলে একটা কর্ম করতে পারে এ যেন তার ধারণার একেবারে বাইরে। সে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর একটি বাখারী নিয়ে সে চলল আমার সঙ্গে সঙ্গে। কিছু পথ নুলিয়াদের ক্ষুদে ক্ষুদে

ছেলেগুলো আমাদের পেছন পেছন নাচতে নাচতে চলল। তারপর বোধকরি তাদের কৌতূহলে ভাঁটা পড়ল অথবা নতুন কোন খেলা মনে পড়ে গেল। অমনি কলরব করতে করতে তারা সমুদ্রের দিকে দৌড় দিলে। যেতে যেতে পেছন ফিরে দেখতে পেলাম সমুদ্র-শিশুরা সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। ঢেউএর ঘোড়ায় চেপে সাদা কেশর ধরে তারা আবার উঠে আসছে বেলাভূমিতে। সমুদ্র স্নেহময়ী জননীর মত তাদের সব আবদার সয়ে চলেছে। কখনো ফেনার উচ্ছ্বাসে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে দূরে, আবার খলখল হাসিতে তুলে নিচ্ছে বুকের ওপর। এ যেন জননীর উন্মত্ত অধীর সন্তান-সোহাগ।

যেতে যেতে বললাম, তোমরা এখানেই থাক বুঝি ?

ও ওড়িয়া ভাষায় যা বলল তার অর্থ হল পুবদিকের সাইতে ওদের নুলিয়া বস্তি রয়েছে। সেখানেই ওরা বসবাস করে। মাছ শুকোয় এখানে। রোদ্দুরের তেজ আর বাতাস আছে তাই পাড়া ছেড়ে এসে এখানে ওদের কাজকর্ম করতে সুবিধে হয়।

কথায় কথায় একদিন ওদের পাড়ায় যাব বলে বললাম। আমার প্রস্তাবে ওর সঙ্কোচের শেষ নেই। ওর ধারণা নোংরা পাড়ায় আবার ভদ্রলোক যায় নাকি! শেষে বললে, যিব বাবু যিব। কথায় কথায় আমরা এসে পড়লাম কেয়াবনের পাশে। প্রতীক্ষাকাতর সুমতি কুমতির মুখ দেখা গেল। নুলিয়ার হাত থেকে আকৃশীটি নিয়ে নিজেই টান মেরে ফুলটাকে পাড়লাম।

ফুলটি কুড়িয়ে নিলাম। এবার 'কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি'। ফুল পেয়ে ওদের আনন্দের শেষ নেই। দেখি নুলিয়াটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে অবাক চোখে ওদের পুষ্প-প্রীতির রকম সকম দেখছে। ওকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু পয়সা ধরে দিলাম। ও চলে গেল। কিছুটা এগিয়েই আবার ফিরে এসে